চার

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্পর্কে মাইকেল নিজেই একবার রাজনারায়ণ বসুকে বলেছিলেন : 'the first poem in the language'[১]। ঈশ্বর গুপ্ত-রঙ্গলালের কাব্যের পরে মধুসূদনের 'তিলোত্তমা সম্ভব' এবং তার পরেই 'মেঘনাদবধ কাব্য,' এ কথা কিছুতেই যেন বিশ্বাস হয় না। সেই 'প্রথম' বাংলা কাব্যের কবি মধুসূদন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্য-সাহিত্য-পাঠের রুচি নিয়ে বাংলাকাব্যের সৃষ্টিতে মনোযোগ দিয়েছিলেন। সুরুচি, স্বদেশপ্রীতি, স্বাধীনচিন্তা ও মানবিকবাদ এই স্থূল লক্ষণগুলি মাইকেলের মধ্যে বিশেষ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল। 'ভারত ভূমি' ও 'বঙ্গভূমি' একটিকে অপরটির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে মনে করে মাতৃসম্বোধনে নিজের মিনতি জানিয়েছিলেন। বায়রনীয় ভঙ্গিতে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মাতৃরূপী native land-এর কাছে তিনি বিদায় চেয়েছিলেন। খৃষ্টান হয়েও পিতৃপুরুষের mythology-র আকর্ষণে 'তিলোত্তমা সম্ভব', 'মেঘনাদবধ', 'বীরাঙ্গনা', 'ব্রজাঙ্গনা' এবং অজস্র সনেট লিখেছিলেন। তবে সে mythology তাঁর স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনা-শক্তিতে নবজাগ্রত মনুষ্যত্ব-মহিমার গাথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'তিলোত্তমা সম্ভব' লিখলেন রোমান্টিক ছাঁদে, 'মেঘনাদবধ' লিখলেন বিদেশী এপিকের আদর্শে ও মনুষ্যত্ববোধের প্রেরণায়, 'বীরাঙ্গনা' লিখলেন হিরোইক এপিস্‌লসের ঢঙে, 'ব্রজাঙ্গনা'কে ode-এর ছাঁচে ঢাললেন, স্বদেশের প্রতি nostalgia প্রকাশ পেল বিদেশী চতুর্দশপদীর নিরেট কঠিন বন্ধনে।

বিদেশী কাব্যের রসে মত্ত হয়ে মাইকেল (১৮২৪-১৮৭৩) তাঁর বাঙালি ঐতিহ্য ও পরিবেশকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডেই তাঁর জীবনের সমস্ত সার্থকতা রূপ নেবে এই দৃঢ় ধারণা ছিল তাঁর। ইংল্যাণ্ডে গেলে ইংরেজ কবিদের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বেন এ আশাও তাঁর ছিল। তিনি ভাবতেই পারতেন না যে, 'বিলেত দেশটা মাটির, সে খাঁটি সোনার নয়।' খৃষ্টান ধর্মের প্রতি তাঁর যে ঘোর আসক্তি ছিল এমন নয়, কিন্তু সাহেব হতে পারবেন এবং বিলাত যাবার সুবিধাও হবে এই জন্যই তিনি খৃষ্টান হয়েছিলেন

(১৮৪৩)। দেশের ধর্মানুষ্ঠান ও তীর্থ-সংস্কারে তাঁর আন্তরিক টান ছিল। তবে খৃষ্টান হয়ে তিনি জীবনে যে মস্ত ভুল করেছিলেন তা নয়। ডক্টর সুকুমার সেনের ভাষায় বলি[২] : 'ইহা তাঁহার উৎকেন্দ্রিক জীবনের বোধকরি একমাত্র শুভ সংঘটন। কেন না ইহার জন্যই তাঁহার ছন্নছাড়া প্রতিভা অন্যথা অসুলভ শিক্ষা ও অনুশীলনের সুযোগ পাইয়া কিছুকালের জন্যও সাহিত্য সৃষ্টিতে সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টান হইলেন কিন্তু বিলাত যাওয়া ঘটিল না—অদৃষ্টের এই পরিহাস তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে যতই মর্মান্তিক হোক, তাঁহার সাহিত্য-জীবনে কল্যাণের হেতু হইয়াছিল। খৃষ্টান হইয়াছিলেন বলিয়া মধুসূদন প্রথমে বিশপ্‌স্ কলেজের ছাত্র হিসাবে, পরে মাদ্রাজে স্কুল শিক্ষকরূপে গ্রীক্ ল্যাটিন সংস্কৃত প্রভৃতি ক্লাসিকাল ভাষা ও সাহিত্য ভালো করিয়া পড়িবার সুযোগ যদি না পাইতেন তবে 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ও 'তিলোত্তমাসম্ভব', 'মেঘনাদবধ', 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের কবিকে আমরা বোধ করি পাইতাম না।'

হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্র মধুসূদন ডিরোজিয়ান ঐতিহ্যকে একেবারে বিস্মৃত হতে দেখেন নি। ইয়োরোপের প্রতি মোহের অনিবার্য টানেই তাঁর মনে বিজাতীয় হবার বাসনা জেগেছিল। এবং তাঁর ওই বিজাতীয় জীবনাদর্শ স্বেচ্ছাচারী ভোগী ইতালীয় হিউম্যানিস্টকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া মাইকেল ছিলেন হিন্দু কলেজের বিশিষ্ট অধ্যাপক ডি. এল. রিচার্ডসনের ছাত্র। শেক্‌স্‌পিয়রের সাহিত্য ও রোম্যান্টিক কাব্যসাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা মাইকেলের মনে তিনিই এনে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যগুলি ও অন্যান্য ক্লাসিক্‌স্ সাহিত্য মাইকেল নিজেই পড়েছিলেন। এ ছাড়া মাইকেল ছিলেন মিল্টনের পরম ভক্ত। এবং যেহেতু ক্লাসিক্‌সের নির্যাস নিয়েই মিল্টন তাঁর 'প্যারাডাইস লস্ট' কাব্যের রূপ দিয়েছিলেন, সেই হেতুই মাইকেল কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মূল রচনার কাছে ঋণী, কোন্ ক্ষেত্রে মিল্টনের অনুসারী, তা নির্ণয় করা শক্ত। কতকগুলি ক্ষেত্রে প্রভাব যে মূলগত তা স্পষ্ট, কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে মূল কবি, মিল্টন এবং মধুসূদন একই কাব্যরীতি প্রয়োগে আমাদের বিভ্রান্ত করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে এ আলোচনা করা যাবে।

মাইকেলের ছাত্রজীবন এবং ইংরিজি ভাষা ও সাহিত্যচর্চার কথা এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আলোচনা করে পরবর্তী জীবনে তাঁর সাহিত্য-চর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টির প্রসঙ্গে আসা যাবে। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন যখন দ্বিতীয়

সিনিয়র শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময়ে রামগোপাল ঘোষ হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যে দুজন স্ত্রী-শিক্ষার বিষয়ে ইংরিজিতে প্রবন্ধ লিখতে পারবে গুণানুসারে তাদের দুটি পদক দেবেন এই প্রতিশ্রুতি দেন। মধুসূদন এই প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক পান। সিনিয়র শ্রেণীতে পড়বার সময় মধুসূদন বহু ইংরিজি কবিতা রচনা করেন। সে সব রচনার কিছু কিছু ইংরিজি-বাংলা জ্ঞানান্বেষণে, লিটারারি গেজেটে, লিটারারি গ্লিনারে প্রকাশিত হয়। ইংল্যাণ্ডে বেন্ট্‌লিস মিস্‌লেনি ও ব্ল্যাকউড্‌স ম্যাগাজিনে মধুসূদন কবিতা পাঠাতেন। এই সব কবিতা রচনায় রিচার্ডসনের বিশেষ উৎসাহ তিনি পেয়েছিলেন। মহাকবি হবার এবং বিলাত যাবার ইচ্ছা তাঁর হিন্দু কলেজে পড়বার সময়েই হয়েছিল।

খৃষ্টান হবার পর তিনি বিশপস্ কলেজে ভর্তি হন। কারণ হিন্দু কলেজে খৃষ্টান ছাত্রের স্থান ছিল না। এই কলেজেই তিনি গ্রীক-ল্যাটিন-সংস্কৃত প্রভৃতি শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। পরে মাদ্রাজ গিয়ে তিনি চারখানি ইংরিজি সংবাদপত্র পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। ১৮৪৮-৪৯ সালে Madras Circulator পত্রে মধুসূদনের 'A Vision' এবং কিছু পরে 'Captive Ladie' কাব্য ও অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়। বন্ধু গৌরদাসের অনুরোধে মধুসূদন একখণ্ড 'Captive Ladie' কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতি বেথুন সাহেবের কাছে পাঠালেন। বেথুন বইটি পেয়ে গৌরদাসকে যা লিখেছিলেন তার মধ্যেই অনতিপরবর্তীকালে রঙ্গলালের ঘোষণার [রঙ্গলাল সম্পর্কিত আলোচনায় উদ্ধার করেছি] মূল উৎস পাওয়া যাচ্ছে[৩] :

> I beg that you will convey my thanks to your friend for the gift of his poem. It seems an ungracious return for his offering that I should take this opportunity through you, of endeavouring to impress on him the same advice which I have already given to several of his countrymen, which is, that he might employ his time to better advantage than in writing English poetry. As an occasional exercise and proof of his proficiency in the language, such specimens may be allowed. But he could render far greater services to his country and have a better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents, which he has cultivated by the study of English, in improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language, if poetry, at all events he must write.
>
> By all that I can learn of your Vernacular literature, its best specimens are defiled by grossness and indecency. An ambitious young poet could not desire a finer field for exertion than in taking the lead in giving his countrymen in their own language a taste for something higher and better. He might even do good service by translation. This is the way by which the literature of most European nations has been formed.

মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর হেমচন্দ্রের জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন :

'দেশীয় ব্যক্তির পক্ষে বিদেশীর ভাষায় কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হওয়ার চেষ্টা যে ব্যর্থ হইবে তাহা Captive Ladie-র সমালোচনা প্রসঙ্গে 'বেঙ্গল হরকরা'র সম্পাদক কিছু অভদ্রভাবে এবং ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন কিছু ভদ্রভাবে মধুসূদনকে বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।'

বেথুনের অভিমত পেয়ে উল্লসিত হয়ে গৌরদাস মধুসূদনকে লিখছেন[৪] :

> We do not want another Byron or another Shelley in English ; what we lack is a Byron or a Shelley in Bengali Literature.

এইভাবে বেথুন ও গৌরদাসের মিলিত অনুরোধে মধুসূদন বাংলা কাব্যের চর্চায় মনোযোগী হন। মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে কৃতসংকল্প হয়ে তিনি বিভিন্ন ভাষা-শিক্ষায় মনোযোগী হন। গৌরদাসকে লেখা একটি চিঠিতে [১৮ই আগষ্ট, ১৮৪৯] আছে :

> **Here is my routine : 6 to 8 Hebrew, 8 to 12 school, 12-2 Greek, 2-5 Telegu and Sanskrit, 5-7 Latin, 7-10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers ?**

এরপর থেকে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বিদেশী ভাব ও পদ্ধতিকে আত্মসাৎ করাতেই মধুসূদন আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সাহিত্যের ধর্ম বজায় রেখে যদি তার মধ্যে বিদেশী ভাবকে মিশিয়ে দেওয়া যায় তাতে নিশ্চয়ই কোন ক্ষতি হয় না। সম্পূর্ণটাই বিদেশী হলে তা এদেশীয় সাহিত্যে চলতে পারে না, কিন্তু কৌশলে উভয় সাহিত্যের মিশ্রণে দেশীয় সাহিত্য যে সমৃদ্ধ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে তিনি গৌরদাসকে যা লেখেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য [তারিখ নেই। ১৮৫৬ থেকে ১৮৫৯এর মধ্যে লেখা] :

> I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my drama ; but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just glowing, the plot interesting, the characters well-maintained, what care you if there be a foreign air about the thing ? Do you dislike Moore's poetry for its Asiatic air, Carlyle's prose for its Germanism ? Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with western ideas and modes of thinking ; and that is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit. .
>
> In matters literary, old boy, I am too proud to stand before the world in borrowed clothes. I may borrow a neck-tie, or even a waist-coat, but not the whole suit.

এই রকম দেশী-বিদেশী আদর্শের সুসমঞ্জস মিলনের আকাঙ্ক্ষা নিয়েই মধুসূদন বাংলা কাব্যচর্চায় এগিয়ে এসেছিলেন। এই ধরনের প্রগতিশীল মনোভাব কোনো বাঙালী কবির ছিল না। বিদেশী কাব্য-সাহিত্য তিনি যা পড়েছিলেন তার কিছু কিছু প্রমাণ তাঁর চিঠিপত্রে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করবার প্রস্তুতি হিসাবে সে পরিচয় জানা বিশেষ প্রয়োজন।

১৮৪১-৪২-এর মধ্যে লেখা চিঠিপত্রের মধ্যে ল্যাটিন কবির উদ্ধৃতি রয়েছে [O tempus !—O Mores]। তখন ল্যাটিন ভাষার সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হয়েছেন। পরে মাদ্রাজে থাকতে ল্যাটিন শিখেছিলেন। শেক্‌স্‌পিয়ারের

বই আদান-প্রদান চলছে গৌরদাসের সঙ্গে সে সময়ে। বায়রনের কাব্য ফেরত দিচ্ছেন গৌরদাসকে। ব্ল্যাকউড্‌স্ ম্যাগাজিনে কবিতা পাঠাচ্ছেন, উৎসর্গ করছেন উইলিয়াম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে। ল্যাটিনে লেখা রোমান ইতিহাসের বই Eutropius চেয়ে পাঠিয়েছেন। ক্রাবের কাব্য ফেরত পাঠাচ্ছেন। বার্নসের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, ক্যাম্পবেল পড়েছেন বলে জানাচ্ছেন, মিউজ বা কাব্যসরস্বতী নিয়ে ঠাট্টা করেছেন, টমাস মুরের লেখা তাঁর প্রিয় কবি বায়রনের জীবনী পড়ছেন। ওথেলো-হ্যামলেট বারবার পড়তে চাইছেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ২৪শে এপ্রিল রাজনারায়ণকে লেখা এক চিঠিতে 'তিলোত্তমা সম্ভব' রচনা কালে অমিত্রাক্ষর ছন্দের কথা বলতে গিয়ে মিল্টন, ভার্জিল ও হোমারের কাব্যের কথা উল্লেখ করেছেন। পনেরোই মে, ১৮৬০-এর চিঠিতে বলেছেন যে, বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণ' না মেনে ইয়োরোপীয় নাট্যাদর্শ অনুসরণ করবেন। ইয়োরোপীয় ক্লাসিকাল সাহিত্যাদর্শ নিয়েও আলোচনা করেছেন। এরিস্‌টট্‌ল, লংগাইনাস, কুইন্টিলিয়ান, সাহিত্যদর্পণ, বার্ক, কামেস (Kames), এলিসন, এডিসন, ড্রাইডেন, ব্লেয়ারের বক্তৃতা, শ্লেগেলের রচনা রাজনারায়ণকে পড়তে বলেছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বরূপ বুঝতে হলে প্যারাডাইস লস্ট বারবার পড়তে হবে বলেছেন। আবার শুধু বায়রন, মুর আর স্কটের ভক্ত বলে রঙ্গলালকে করুণাও করেছেন। বলেছেন (১ জুলাই, ১৮৬০) :

> As for me, I never read any poetry except that of Valmiki, Homer, Vyasa, Virgil, Kalidas, Dante (in translation), Tasso (do) and Milton, These কবিকুলগুরু-s ought to make a fellow a first rate poet—if Nature has been gracious to me.

পরের চিঠিতে (১৪ জুলাই, ১৮৬০) লিখছেন, ইটালিয়ান Ottava Rima-তে স্তবক রচনা করে একটি রোম্যান্টিক গাথাকাব্য রচনার অভিপ্রায় তাঁর আছে। ওই চিঠিতেই বলছেন রামের যদি মানুষ সঙ্গী থাকতো তাহলে মেঘনাদের মৃত্যুর ওপর দ্বিতীয় ইলিয়াড লিখতে পারতেন। এই সময়ে 'মেঘনাদবধ কাব্যের' প্রথম সর্গ লিখে শেষ করেছেন। পরের চিঠিতে [তারিখ নেই] বলছেন :

> It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own ; in the present poem,

I mean to give free scope to my inventing Power (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki.

আরও বলেছেন :

I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done. Before I began this letter, I wrote the following opening lines for the second book of মেঘনাদ।—These lines ought to give you some idea of the Episode that is to follow.

কি কারণে ত্যজি লঙ্কা কহ, শুভঙ্করি
সারদে, প্রবাসে বাস করে শূরমণি
মেঘনাদ? কোন দেব, মোহের শৃঙ্খলে,
(কিনা তুমি জান সতি?) বাঁধেন কুমারে,
বন্দীসম, দূরে এবে-এ বিপত্তি কালে?···

You will at once see whom I imitate

"Who of the Gods impelled them to contend?
Latona's sons and Jove's"—Cowper's Homer's Iliad.

Milton has imitated this—

"Who first seduced them to that foul revolt? The infernal serpent"—Book I

পরের চিঠিতে বাংলা ভাষার দ্রুত জড়তামুক্তি এবং নিখুঁত শিল্পকর্মের দিকে সে ভাষার অগ্রগতি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ইটালীয় কবি ভিত্তোরিয় আলফায়েরি [১৭৪৯-১৮০৩]-র একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন :

Really what rapid advances our Language (I feel half-tempted to use the words of Alfiery and say 'Nostrra Divina Lingua') is making towards perfection and how it is shaking off its sleep of ages.

আশ্চর্য এই, মধুসূদন নিজেই এই ঘুম ভাঙানোর কাজ করেছিলেন।

পরে রাজনারায়ণকে লিখছেন যে [১৮৬০ই হবে, তারিখ নেই] মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গ পড়তে পড়তে ইলিয়ডের চতুর্দশ সর্গের কথা অবশ্যই মনে পড়বে :

...I am not ashamed to say that I have intentionally imitated it—Juno's Visit to Jupiter on Mount Ida. I only hope I have given the Episode as thorough a Hindu air as possible... .I fancy the versification more *Melodious* and *Virgilian* and the language easy and soft. You will probably miss in this Poem the rather *Roughish* elevation of its predecessor.

এডুকেশন গেজেটে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' সম্পর্কে রঙ্গলালের সম্পাদকীয় মন্তব্যের উত্তরে (১৮৬২ পর্যন্ত বঙ্গলাল গেজেটের সহকারী সম্পাদক ছিলেন) মাইকেল একটি চিঠিতে লিখেছেন :

I do not know if you read the Education Gazette If you do, you have no doubt seen the Editor's remark on Blank verse I do not think R. either reads or can appreciate Milton, otherwise he would not have made the remarks in the concluding portion of his article. He reads Byron, Scott and Moore, very nice poets in their way no doubt, but by no means of the highest School of poetry, except, perhaps, Byron, now and then. I like Wordsworth better.

ওই চিঠিতেই তারপরে লিখছেন :

I am just now reading Tasso in the original,—an Italian gentleman having presented me with a copy. Oh! what luscious poetry. If God spares me for some years yet, I shall write a poem, a Romantic one, in the *Ottava Rima* or stanzas of eight lines like this. Perhaps I shall write your "সিংহল বিজয়" in that measure.

পরের চিঠিতে রাজনারায়ণকে লিখছেন যে মেঘনাদবধের ষষ্ঠ ও সপ্তম সর্গ শেষ করে অষ্টমে হাত দিয়েছেন। ইনিয়াসের মতো রামকেও নরকের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে পিতা দশরথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। আর একটি চিঠিতে নিজেই বিস্মিত হয়ে লিখছেন :

I had no idea, my dear fellow, that our mother tongue, would place at my disposal such exhaustless materials; and you know I am not a good scholar.

ওই চিঠিতেই লিখছেন যে হিরোইক পোইট্রি আর লিখবেন না, রোম্যান্টিক ও লিরিক কবিতার প্রশস্তক্ষেত্র পড়ে রয়েছে, নিজের মধ্যেও লিরিক্যাল প্রবণতা অনুভব করছেন। আর একটি চিঠিতে মহাকবিদের সম্বন্ধে বলেছেন যে, সংস্কৃতের কালিদাস, ল্যাটিনের ভার্জিল, ইটালির তাসোকে শ্রদ্ধা জানানো উচিত। ইংল্যাণ্ডে এমন কোন কবি নেই, যাঁদের এই তিনজনের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসানো যেতে পারে। অবশ্যই মিল্টন ছাড়া। মিল্টন এঁদের চেয়েও মহত্তর (রাজনারায়ণকে লেখা, তারিখ নেই) :

Like his own Satan, he is full of the loftiest thoughts, but has little or nothing that may be called amiable He elevates the mind of the readers to a most astonishing height, but he never touches the heart. . . .He is Satan himself.

পরে বলেছেন :

Homer is nothing but battles I have, like Milton, only one That is in Book VII.

তার পরের চিঠিতেই ব্রজাঙ্গনা-প্রকাশের কথা আছে। ব্রজাঙ্গনাকে তিনি নিজেই 'Odes' বলেছেন। এই ধরনের অসমচরণ, প্রশস্তি-মূলক কবিতা আমাদের কাব্যে ছিল না। তারপরে মিল্টন এবং শেক্‌স্‌পিয়ার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন কী ভাবে ধ্বনি-সৌন্দর্য ও ছন্দসংগতি বজায় রেখে তিনি তাঁর কাব্যে বিদেশী ভাব গ্রহণ করেছেন। পরের চিঠিতে চিন্তিত হয়েছেন, আর মহাকাব্য লিখলেও মেঘনাদবধকে অতিক্রম করতে পারবেন না হয়তো, হয়তো শেষ কটা দিন লিরিক আর সনেট লিখেই কাটিয়ে দিতে হবে। তবু, মহাকাব্য লেখার নেশা যায় না। বলছেন : 'The idea is intolerable. Give me the সিংহল, old boy.

পরের চিঠিতেই জানিয়েছেন, হিরোইক এপিসিলস্ লিখছেন 'বীরাঙ্গনা' নাম দিয়ে। কেশব গাঙুলিকে একটি চিঠিতে লিখছেন যে, সুভদ্রার প্রথম সর্গ পাঠিয়েছেন। দ্বিতীয় সর্গ পাঠাচ্ছেন। এটিকে অভিনয় করবার নাটক না বলে

নাট্য-কবিতাই বলা উচিত বলছেন। বলা বাহুল্য, ইয়োরোপীয় ধরনে বাংলায় এই নাট্য-কবিতা ধারার উৎসও তিনি। অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে লিখছেন (তারিখ নেই) :

Take my word for it, that Blank Verse will do splendidly in Bengali and that in course of time, like the modern Europeans, we too shall equal, if not surpass, our classic writers . My motto is 'Fire away, my boys'. The Namby-Pamby-Wallahs—the imitators of Bharat Chandra—our Pope, who has 'Made poetry a mere mechanical art, And every warbler has his tune by heart !'

ইয়োরোপের ভের্সাই থেকে লিখছেন (৯ জুন, ১৮৬৪) :

Though I have been very unhappy and full of anxiety here, I have nearly mastered French. I speak it well and write it better. I have also commenced Italian and mean to add German to add to my stock of languages—if not Spanish and Portuguese, before I leave Europe.

বিদ্যাসাগরকেও আর একটি চিঠিতে লিখছেন (১১ জুলাই, ১৮৬৪) :

You cannot imagine what beautiful poetry there is in Latin. Tasso is really the Kalidasa of Europe. I wrote a long letter in Italian to Satyendra the other day, but he has replied it in English.

চারের দশকে মাইকেলকে রোম্যান্টিক কাব্য পড়তে দেখা গেছে। তখন, ইংরিজিতেই তাঁর কবিতা রচনার যুগ চলছে। তখন বার্নস, স্কট, বায়রন, শেলি, কীট্‌স্, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁর নিত্য সঙ্গী। তাঁদের কাব্যের ছাঁদেই মধুসূদন তাঁর নিজের কাব্যের কাঠামো তৈরি করেছিলেন। ভাবেও রোম্যান্টিকদের উচ্ছ্বাস ও দীর্ঘশ্বাস শোনা যেত, বিশেষ করে বায়রনের উচ্ছ্বাস তাঁকে মন্ত্র-মুগ্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু তারপরে বেথুন সাহেবের বা গৌরদাসের অনুরোধে যখন মাতৃভাষায় কাব্যচর্চায় মন দিলেন তখন তিনি বিদেশী মহাকবিদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছেন, এবং তখন থেকেই বন্ধু রজলাল মিল্টন না পড়ে শুধু রোম্যান্টিক কাব্য পড়েন বলে তাঁকে তাচ্ছিল্য করেছেন, আর অনুসরণ করতে

হলে মহাকবিদের highest school of poetry-র অনুসরণ করাই উচিত বলে মনে করেছেন। সমসাময়িক যুগের রোম্যান্টিক কাব্য-সাহিত্য, মিল্টন ও শেক্স্‌পিয়ারকে অতিক্রম করে কী ভাবে মধুসূদন গ্রীকো-রোমান সংস্কৃতির দেহলিস্পর্শ করলেন তা মোহিতলালের ভাষাতেই প্রকাশ করতে পারি[৫] :

'যে ভাবচিন্তার আঘাতে সেকালের বাঙ্গালী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল ইংরেজ চরিত্র ও ইংরেজের শাসননীতিগত আদর্শ—একথা পূর্বে বলিয়াছি; কিন্তু ইংরেজী বিদ্যার মূলে যেমন, তেমনই ইহারও মূলে ছিল সেই গ্রীক্‌-রোমক সংস্কৃতি—যাহা সেমিটিক বা খ্রীষ্টীয় ধর্মনীতিকেও অভিভূত করিয়া আত্মার উপর দেহ ও দেহাধিষ্ঠিত প্রাণমনকে স্থান দিয়াছিল, অতীন্দ্রিয়ের উপরে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান বা যুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সেই সংস্কৃতিই সেকালের বাঙ্গালী মনকে—যে মন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতীয় মধ্য যুগের সংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, সেই মনকে আঘাত করিয়াছিল, তাহার সেই পারলৌকিকতা ও mysticism-কে এই নূতন দেহাত্মবাদ বা স্বভাবধর্মবাদ নিরতিশয় বিচলিত করিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের নব ভাবরাজিও তখন পরোক্ষভাবে ইংরেজ পণ্ডিত ও শিক্ষাগুরুর মারফতে নব্য বাঙ্গালীর চিত্তে সংক্রমিত হইতেছিল। অতএব যে সংস্কৃতি একদা য়ুরোপে নবজাগরণ আনিয়াছিল, যাহার ফলে humanities বা মানববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার উপরে স্থান পাইয়াছিল, এবং মনুষ্যজীবনগত পরম রহস্যের প্রতি শ্রদ্ধা বা humanismই মানুষকে এক নবধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিল আমাদের পক্ষে তাহা সঞ্জীবন মন্ত্রের মত কাজ করিয়াছিল, সেই মানবতা বা মর্ত্য-প্রীতির প্রেরণাই আমাদিগকে চঞ্চল করিয়াছিল।…

'রামমোহন রায় যাহাকে মনীষার দ্বারা সর্ব প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন, মধুসূদন তাহাকেই প্রাণের মধ্যে লাভ করিয়াছিলেন—সে অনুভূতি যেমন সরল—তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত। তাই তিনি য়ুরোপের ঊনবিংশ শতাব্দীকে, এমন কি শেক্স্‌পিয়র ও মিল্টনকেও অতিক্রম করিয়া, আরও আদি ও অকৃত্রিম উৎস-বারিতে তাঁহার প্রাণ-পাত্র পূর্ণ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষপর্যন্ত তিনি হোমারকে ভুলিতে পারেন নাই, বাংলা গদ্যে হোমারের মূল মহাকাব্যের অসমাপ্ত অনুবাদই তাঁহার শেষ সাহিত্য-কর্ম। য়ুনানীর কবির সেই আদি-কাব্য-প্রেরণার মধ্যেই তিনি আপন প্রাণের

প্রতিধ্বনি পাইয়াছিলেন, তাঁহার সেই সুস্থ সবল মানবতা এবং নির্দ্বন্দ্ব ও নিশ্চিন্ত জীবন-ধর্মের অনুধ্যানে তিনি নিজের অশান্ত প্রাণকে শান্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি…এমন একটা কিছুকে আশ্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহা মানব প্রকৃতির আদিধর্ম, যাহা শাস্ত্রবিধি অপেক্ষাও সত্য ও বলবান, পৃথিবীর মতই যাহা নিত্য নূতন ও চির পুরাতন, যাহা ফুলের মত আপন স্বভাবধর্মেই সুন্দর, পার্থিবতাই যাহার স্বাস্থ্য, বীর্যে ও জীবনবেগে যাহা মহিমাময় এবং পরিপূর্ণ বিকাশের পরে কালের নির্মম কুঠারাঘাতে যাহা করুণ। মেঘনাদবধের কাহিনী ইহারই একটি রূপক,—কবি মানবজীবন ও মানবভাগ্যের সেই পার্থিবতাকে পরমশ্রদ্ধার সহিত বরণ করিয়াছেন।.'

মধুসূদনের মন ক্লাসিক্‌সের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এমনভাবে যে, ছাত্র-জীবনের আদর্শ রোম্যান্টিক কাব্য-সাহিত্যের উল্লেখ পরবর্তীকালের চিঠি-পত্রেও বিশেষ নেই। রঙ্গলাল প্রসঙ্গে দু-একবার মাত্র উল্লেখ আছে। একবার নিজের ভেতরকার লিরিক প্রবণতাকে যখন বুঝতে পেরেছেন, তখন রোম্যান্টিক কাব্য-সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র যে পড়ে রয়েছে সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন। এছাড়া সমসাময়িক রোম্যান্টিক কাব্য-সাহিত্যের সম্পর্কে তাঁর কোনো উৎসাহ দেখি না। আর একটি ব্যাপারেও তাঁর সমসাময়িক যুগের প্রতি উদাসীনতার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তিনি ফ্রান্স থেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে সব চিঠিপত্র লিখেছিলেন (২রা জুন, ১৮৬৪ থেকে ২৬শে এপ্রিল, ১৮৬৫) তাতে ইটালিয়ান, জার্মান ও ফরাসি ভাষা আয়ত্ত করবার সংবাদ আছে। পেত্রার্কের সনেট পড়ে চতুর্দশপদী রচনার প্রেরণা পাচ্ছেন এও জানতে পারছি। কিন্তু স্যাঁৎ বোভ্‌, র‍্যাঁ, ত্যেন, ফ্লবেয়র, গোতিয়ে, বোদল্যের, ল্য কঁৎ দ্য লীল ইত্যাদি তখন ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত লেখক। বিশেষ করে বোদল্যেরের কথা মনে হয়। তাঁর Les Fleurs du Mal ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে, ফ্রান্সের সাহিত্যিক মহলে হৈ চৈ হয়েছে এবং ওই বছরই Les Fleurs du Mal-এর ছটি কবিতাকে অশ্লীল বলে বাদ দেওয়া হয়েছে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি মধুসূদন যখন প্যারিসে, বোদল্যেরও তখন প্যারিসে রয়েছেন। ১৮৬৪তে মধুসূদন ভের্সাইতে গেছেন। বোদল্যেরও প্যারিস থেকে ওই বছরই এপ্রিল মাসে বেলজিয়ামে গেছেন। কিন্তু মধুসূদনের মানসিকতায় এবং চিঠিপত্রে তার কোন স্পর্শ নেই। এসব কথা বলার কারণ আর কিছুই নয়, শুধু এইটুকুই প্রমাণ করা যে, মধুসূদন সেই 'আদি

ও অকৃত্রিম উৎস বারি'তে এমনই নেশাগ্রস্ত হয়েছিলেন যে, সমসাময়িক কাব্য-সাহিত্য তাঁকে মোটেই আকর্ষণ করতে পারে নি। হয়তো তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, নতুন বাংলা কাব্য প্রতিষ্ঠায়, যে ক্ষেত্রে 'there is nothing like cultivating and enriching our own tongue'-ই উদ্দেশ্য, সে ক্ষেত্রে ক্লাসিক্‌স্‌ই আদর্শ হওয়া উচিত, যেহেতু সেই আদর্শ সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আগেই বলেছি, বিদেশে গিয়েও তাঁকে দেখেছি, ফরাসী, ইটালিয়ান ও জার্মান —এই তিনটি ভাষা আয়ত্ত করছেন এবং সে ভাষাগুলির ক্লাসিক সাহিত্য পড়ছেন। তিনি বলেছেন: 'I have already opened the door'। কেবলই নতুন নতুন সাহিত্যের রাজ্য আবিষ্কারের দিকে মন তাঁর, নতুন নতুন ইয়োরোপীয় ক্লাসিক্‌সের দ্বারোদ্‌ঘাটন করে চলেছেন তিনি। এদিকে দারুণ অর্থকষ্টে পড়েছেন, এবং তাঁর নিজের ভাষায়, সৃষ্টি-প্রতিভার 'fit' চলে গেছে। কাজেই যে ফ্রান্স ল্যাটিন সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র সেখানে গিয়ে ক্লাসিক্‌সের পাঠক ও ভক্ত মাইকেল কেবল ক্লাসিক্‌সের চর্চাতেই নিবিষ্ট থেকেছেন। এবং ইংরিজি সাহিত্যের সমসাময়িকদের সম্পর্কে যতটা তিনি সচেতন, ইটালিয়ান ফরাসি ও জার্মান সাহিত্যের সমসাময়িকদের সম্পর্কে ততটা হতে পারেন নি, কারণ এই তিনটি ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল নতুন, মানসিক স্থৈর্যও অব্যাহত ছিল না।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০) মাইকেল যখন লেখেন তখন তাঁর ছাত্র-জীবনের রোম্যান্টিক কাব্যাদর্শ মন থেকে দূর হয়নি। মাতৃভাষায় তখনও ক্লাসিক আদর্শকে পুরোপুরি প্রয়োগ করবার মতো মানসিক প্রস্তুতি আসে নি। 'তিলোত্তমাসম্ভব' যখন লেখা হলো তখন মহাকবিদের সঙ্গে তিনি যে পরিচিত তার প্রমাণ চিঠিতেই আছে। কিন্তু সে কাব্যকে পাছে লোকে মহাকাব্য মনে করে ভুল করে সেই জন্যই তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন: 'it is a tale heroically told'-এই মাত্র। দেব-দৈত্য মহাকবির দৃষ্টিতে মানুষোচিত হয়ে ওঠেনি, দেব-দৈত্যই আছে, তিনি নিজেই বলেছেন: 'I could not by any means shove in men and women.' রোম্যান্টিক কাহিনীকাব্যের ছাঁদেই দেব-দৈত্যের দ্বন্দ্ব যথাস্বরূপে বর্ণিত হয়েছে।

মাইকেল 'তিলোত্তমাসম্ভব' যখন লিখছেন তখন 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনারও প্রস্তুতি চলছে। অর্থাৎ গ্রীক পুরাণ তাঁর আয়ত্তে এসে গেছে। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র 'ব্রহ্মা'র ভূমিকায় গ্রীক দেবপতি জিউসের প্রভাব

আছে। জিউসের মতো মধুসূদনের ব্রহ্মা স্বেচ্ছাচারী, দেবতারা তাঁর প্রজা। 'বিশ্বকর্মা' হোমারের হেফাইস্‌টোসের মতো সূক্ষ্ম শিল্পী। 'নিদ্রা' ও 'স্বপ্নদেবী' গ্রীক ছাঁচে গড়া। তাদেরই অনুসরণে 'ভক্তি', 'আরাধনা' প্রভৃতি দেবীর কল্পনা[৫]। 'বায়ুপতি' হলো গ্রীক দেবতা এওলাস। দেবদূতী এবং দৈববাণীও গ্রীক পুরাণের নকলে। এক্ষেত্রেও বিধির নির্বন্ধ যে অখণ্ডনীয় এই গ্রীক বিশ্বাস দেবতাদের মুখে শুনতে পাওয়া গেছে।

প্রথম দুটি সর্গে এবং চতুর্থ সর্গের প্রারম্ভে বীণাপাণির আহ্বান হোমারের অনুসরণে 'শ্বেতভুজা' শব্দটিও গ্রীক 'লেউকালেনোস' শব্দের অনুবাদ।[৬] কয়েকটি উৎপ্রেক্ষাও হোমার থেকে গৃহীত। যেমন:

ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে,·· ··· ১ম সর্গ।

এ উৎপ্রেক্ষা হোমারের ইলিয়াড থেকে নেওয়া[৭]:

As the dust, when it lies thick in the roadways on a stormy day, is caught up by the blustering wind and rolled into a great and solid cloud. Book XIII.

পবন দেব যখন বিশ্বকর্মাকে আনতে চলেছে তখন যে যমপুরীর দৃশ্য তার চোখের সামনে পড়েছে তার সঙ্গে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অষ্টম সর্গের প্রেতপুরীর বর্ণনার কোনো পার্থক্য নেই। দান্তে, ভার্জিল ও মিল্টন তখন মাইকেলের মনের প্রেত-পুরীর ধারণা স্পষ্ট করে দিয়েছে। 'মেঘনাদবধে'র মেঘনাদ ও রাবণের মতো 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'ও রাক্ষসদের ওপর ট্র্যাজিক মহিমা আরোপের চেষ্টা হয়েছে। সুনাসীরের উক্তিতে পাওয়া যাচ্ছে:

সুন্দ উপসুন্দাসুর, হে শূরেন্দ্র রথি,
অরি মম, যমালয়ে গেছে দোঁহে চলি
অকালে কপাল দোষে। আর কারে ডরি?
তবে বৃথা প্রাণিহত্যা কর কি কারণে?
নীচের শরীরে বীর কভু কি প্রহারে
অস্ত্র? উচ্চতরু-সেই ভস্ম ইরম্মদে।
বিশ্বনাশী বজ্রাগ্নিরে অবহেলা করি,
জিনিল যে বাহুবলে দেবকুল রাজে,

কেমনে তাহার দেহ দিবে সবে আজি
খেচর ভূচর জীবে ? বীর শ্রেষ্ঠ যারা
বীরারি পূজিতে রত সতত জগতে ! চতুর্থ সর্গ।

এই মহিমাই স্পষ্টরূপে ধরা দিয়েছে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মধ্যে। অচিরেই মহৎ সৃষ্টির উদ্যোগে যে শিল্পী রাশীকৃত উপকরণ সংগ্রহ করছেন, সেই উপকরণের সামান্য কিছু দিয়ে যেন অবহেলায় একটি ক্ষুদ্র প্রতিমা নির্মাণ করলেন। নির্মাণে নিখুঁত বস্তুরূপ নেই, বাহুল্য-আতিশয্যও আছে, তবে তার থেকেই মহাকাব্যের পরিমাণ জ্ঞান তাঁর হয়ে গেল। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই আতিশয্য ও অপরিমাণের কারণ মাইকেলের ছাত্রজীবনের রোম্যান্টিক আদর্শ। 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে' বর্ণনা ঘটনাকে চাপা দিয়েছে। যেন গ্যালারির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে যে ছবি দেখছেন সেই ছবির প্রশংসাতেই মুখর হয়ে উঠছেন। প্রথম সর্গের প্রারম্ভে সরস্বতীকে সম্বোধন করে হৃত দেব-বৈভবের জন্য যে বিলাপ আরম্ভ করেছেন তা অতিদীর্ঘ হয়ে পড়েছে। স্বর্গের প্রতিটি অনুপস্থিত দ্রষ্টব্যের প্রতি পৃথক মনোযোগ দিতে দিতে চলেছেন। তারপর দেবতাদের দুরবস্থার জন্য বিলাপ, দেবকুলপতির বিবাদ, তাঁর পত্নীকে আনবার জন্য স্বপ্ন দেবীর যাত্রা, ধবল শৃঙ্গে সৌন্দর্য-স্বরূপিনী ইন্দ্রাণীর আবির্ভাব, তাঁর যাত্রাপথের বিচিত্র সৌন্দর্য কবিকে অনেকক্ষণ আকৃষ্ট করেছে। তারপর ব্রহ্মলোকের বর্ণনা, সেখানে স্বর্গোদ্ধারের জন্য দেবতারা ব্রহ্মের কাছে প্রার্থনা জানালেন। অতঃপর দৈব-বাণীতে জানা গেল, বিশ্বকর্মার সৃষ্ট তিলোত্তমার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সুন্দ উপসুন্দ পরস্পর বিবাদ করে বিনষ্ট হবে। বিশ্বকর্মাকে আনতে চললো পবন। এই যাত্রার সুযোগে কবি ঝড়ের প্রতিক্রিয়া, যমপুরীর বর্ণনা, অবশেষে বিশ্বকর্মার পুরীর বর্ণনা এবং তাঁর ঐশ্বর্যের বর্ণনা করেছেন। ব্রহ্মপুরে এলেন বিশ্বকর্মা। সেখানে তিলোত্তমা সৃষ্টি হলো ধীরে ধীরে। জীবন দান করলেন তিনি। কাম্যবনে বসন্ত এলো, তিলোত্তমা ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কবি এই ভ্রাম্যমান সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তিটির নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। লক্ষণীয় যে, পরিবেশের মধ্যে আদিরসের স্পর্শ থাকলেও তিলোত্তমার এই গতিশীল সৌন্দর্য বর্ণনায় সে রসের কোন স্পর্শ নেই। নিছক সৌন্দর্য উপভোগের এই হলো সূচনা। যাই হোক, দৈত্যগণ অতঃপর বিলাসে মত্ত হলেন। জয়ের পূর্ব-স্মৃতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তিলোত্তমাকে দেখে কাম-মোহিত হয়ে সুন্দ-উপসুন্দ পরস্পর যুদ্ধে রত হলেন, সুন্দ মরলেন। বিলাপে বিলাপে প্রাণ হারালেন উপসুন্দ।

এই কাহিনী কল্পনার জালে চারটি বিস্তৃত সর্গে বাহুল্য পেয়েছে। বর্ণনা মানেই কল্পনার ক্ষেত্র। সে ক্ষেত্রে মাইকেল নিজেকে সংযত করেন নি. সমগ্র কাব্যের সামঞ্জস্য রক্ষার কথাও ভুলে গেছেন। গ্রীক পরিবেশ, হোমারিক মহোপমা, রোম্যান্টিক সৌন্দর্য-তৃষ্ণা, উপভোগের তীব্রতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে বর্ণনা-বাহুল্যের আশ্রয়, আদিরসাত্মক পৌরাণিক উপমা-উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদির মিশ্রণে নতুন বাংলা কাব্য রচিত হলো। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন : 'আমরা মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশ হইতে নূতন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইব।'[৮]

বঙ্গলালের পদ্মিনী কাব্যে বিষয় ও ভাব প্রকাশের রীতি যে অনেক ক্ষেত্রে নতুন তা আগেই দেখেছি। কিন্তু মাইকেলের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' প্রাচীন বিষয়বস্তুকে রোম্যান্টিক ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং উপস্থাপনের বাহন যে ভাষা ও ছন্দরীতি—তাও দেশী-বিদেশী রীতির মিশ্রণে এক নতুন বস্তু।

মধুসূদনের এই বেহিসেবী রোম্যান্টিক মন সংযত হয়েছে 'মেঘনাদবধ কাব্যে' (১৮৬১)। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' কবি প্রথমেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে চলে এসেছেন। মেঘনাদবধ যে সাধারণ সম্মুখ সংগ্রামের ব্যাপার নয়, কৌশলের ব্যাপার, সে ইঙ্গিতও করেছেন কবি। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' প্রায় শত পংক্তি অতিক্রম করে প্রতিপাদ্য বিষয়কে পাওয়া গেছে। সে ক্ষেত্রে চতুর্থ সর্গে মূল ঘটনা ঘটেছে, তবে তার প্রস্তুতি চলেছে তিন সর্গব্যাপী। 'মেঘনাদবধে' কবিকে অনেক বেশী চরিত্র, বেশী ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে। কিন্তু সর্বত্রই কবি তা আয়ত্তের মধ্যে রেখেছেন। কোনো বর্ণনা মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য ও সংযমকে অতিক্রম করে যায় নি। প্রত্যেকটি verse paragraph অনতিদীর্ঘ, প্রয়োজনীয় পরিবেশ ও চরিত্র বিকাশ ঘটিয়ে শেষ হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন অভিপ্রায়, ভবিষ্যৎ-বাণী বা সঙ্কল্পকে সংহত করা হয়েছে। প্রথম সর্গ থেকেই verse paragraph-এর শেষে 'কার রে বাসন বাস করিতে আঁধারে', 'কত যে মরিল আর কে পারে গণিতে', 'হায়, নাথ, নিজ কর্মফলে, মজালে রাক্ষসকুলে, মজিয়া আপনি', 'অরাবণ অরাম বা হবে ভব আজি', 'প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে' ইত্যাদি পংক্তিগুলি মহাকাব্যিক সংযমের পরিচয়। এই পরিচয়ের প্রশংসা করে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন[৯] : যাঁহারা তীরে বসিয়া সমুদ্রের তরঙ্গ-আক্ষেপ লক্ষ্য করিয়াছেন,

তাঁহারা নিশ্চয় দেখিয়াছেন যে নিরন্তর প্রহত তরঙ্গমালা কিভাবে ফেণপুঞ্জে পরিণত হইয়া ওঠে। মধুসূদনের পংক্তি-ব্যূহের পরিণামও সেইরূপ সুদীর্ঘ বক্তব্যের ঘনীভূত ফেণীভবন।···এ গুণের মূলে আছে ক্লাসিক্যাল রীতির আত্মসংযম ও আতিশয্যবিসর্জন। এ গুণে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।'

বলা বাহুল্য, এ গুণ ক্লাসিক্‌স্ পাঠেরই ফল। লঙ্কাপুরীতে ধীরে ধীরে শোকের ছায়া নেমেছে, একে একে বীরের পতন হয়েছে, কিন্তু তাতে কোথাও পরিবেশের তারল্য ঘটেনি। এক একটি শোক যেন এক একটি সঙ্কল্পকে দৃঢ় করে তুলেছে। যে রাবণ দুঃখ করে বলেছেন: 'ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?' সেই রাবণই সঙ্কল্প নিয়েছেন: 'অরাবণ অবাম বা হবে ভব আজি'। তৃতীয় সর্গে যে প্রমীলাকে আমরা দেখেছি 'পতি-বিরহে কাতরা যুবতী', সেই প্রমীলাই বলেছে: 'পশিব নগরে / বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে / রঘুশ্রেষ্ঠে, এ প্রতিজ্ঞা বীরাঙ্গনা মমঃ / নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে!' মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণের বিলাপকে 'বিলাপ' না বলে নিঃশেষিত শক্তির 'আক্ষেপ' বলাই ভাল। সে আক্ষেপে মথিত ফুলদলের ক্রন্দন-রস নেই,—বজ্রাহত শাল্মলী তরুর সারগর্ভহীন পতনের শব্দ আছে।

হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে!
হা মাতঃ রাক্ষস-লক্ষ্মি কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে!

এ গাম্ভীর্য মহাকাব্যোচিত। দেশী-বিদেশী ক্লাসিক্যাল কবিদের কাছ থেকেই এই সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর মাইকেল চমৎকারভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। তবে কোথাও কোথাও ক্লাসিক্‌সের মর্যাদা রাখতে গিয়ে কাব্যের সামঞ্জস্য রাখতে পারেন নি। যেমন 'ইনিডে'র অনুসরণে প্রেতপুরীর বর্ণনা। মহাকাব্যের প্রথানুসরণের কথা মনে রেখেও একথা বলা চলে যে, প্রায় সাড়ে তিন শো পংক্তির নরক বর্ণনা প্রাসঙ্গিক দৃশ্য বর্ণনার পক্ষে অবান্তর ও অতি দীর্ঘ মনে হয়। এক্ষেত্রে বিদেশী আদর্শ অনুসরণ তাঁর মতো শিল্পীর পরিমিতিবোধকে নষ্ট করেছে।

যখন 'মেঘনাদবধ কাব্য' লেখা চলছে, তখন মাইকেল রাজনারায়ণ বসুকে লিখছেন:

It is my ambition to engraft the exquisite graces of Greek mythology on our own : in the present poem, I mean to give free scope to my inventing powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you You shan't have to complain again of the un-Hindu character of the poem. I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done.

কিন্তু যে যুগ অতিক্রান্ত তাকে হুবহু ধরে রাখা সম্ভব নয়। সে যুগের মত করে লেখাও অসম্ভব। মাইকেল গ্রীক জানতেন এবং গ্রীককাব্যরসিক ছিলেন। ইলিয়াড ও ওডিসিব কাহিনীর উত্তেজনায় তাঁর নেশা হতো। তাই রামায়ণ কাহিনীর 'মহৎ ও স্নিগ্ধ কবিত্বেব উপর ইলিয়াড কাহিনীর কঠিন ও দীপ্ত শৌর্যের রঙ' মিশিয়ে 'মেঘনাদবধে' নতুন কাব্য-কল্পনার শক্তি দেখালেন মাইকেল। এর চেয়ে বেশী গ্রীকদের মত করে লেখা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। কারুব পক্ষেই সম্ভব নয়। হোমারের কোনো কোনো চরিত্র ও ঘটনা, গ্রীকদের দৃষ্টিভঙ্গি, গ্রীক মহাকাব্যের কোনো কোনো উপমা উৎপ্রেক্ষা 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে সমৃদ্ধ কবেছে।

শিব-উমা অনেকটা জিউস-হেরার মতো। জিউসেব কন্যা এথেনার মত মহামায়াকে স্বতন্ত্র দেবী রূপে কল্পনা কবা হয়েছে। মেঘনাদবধের স্কন্দ জিউস-হেরার পুত্র আরেসেব (যুদ্ধের দেবতা) মতো। মেঘনাদের অন্তিম পরিণতি হেক্টবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণের ব্যবহার পাট্রোক্লাসের মৃত্যুতে আখিল্লেওসের, আর খানিকটা হেক্টরের মৃত্যুতে প্রিয়ামোসের আচরণের মতো। প্রমীলা কতকটা হেক্টরেব স্ত্রী অ্যাণ্ড্রোম্যাকির মতো এবং কতকটা তাস্‌সোর কাব্যের রণরঙ্গিণী ক্লোরিণ্ডার মতো। আর গ্রীক সাহিত্যের দৈবনির্বন্ধবাদ সমগ্র 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে ঘিরে আছে। হোমারিক দেবতাদেব সম্পর্কে বলা হয়েছে[১০]:

There is a limit to their power, a basic 'so far and no farther' That limit is death. No God can restore life to a man once dead, no will of the gods can reach into the shadowy realm of the departed.

শিলারের Name যখন বলেছিল :

Nor did his immortal mother save the hero divine.
When, falling at Scaean gate, he fulfilled his doom.

তখন গ্রীক দৈবকেই ইঙ্গিত করেছিল। ওডিসিতে এথেনা বলেছে ::

Death is certain and when a man's fate (moira) has come, not even the gods can save him, no matter how they love him ! [moira was a daimon of doom and death.]

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রতিটি সর্গে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে, রাবণের মুখে তো বটেই, আমরা সেই 'দারুণ বিধি'র (moira)কথা বারবার শুনেছি।

কয়েকটি ঘটনার ওপরেও ইলিয়াডের ছায়া পড়েছে। ইলিয়াডে যেমন দেব-দেবীরা ছদ্মবেশ ধরে গ্রীকদের বা ট্রোযানদের পরামর্শ দিয়েছে, মেঘনাদ-বধেও তাই। 'মেঘনাদবধে'র দ্বিতীয় সর্গে উমার প্রসাধন এবং শিবকে ভুলিয়ে তাঁকে রাবণের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার চেষ্টা ইলিয়াডের চতুর্দশ সর্গের হেরার প্রচেষ্টার স্মৃতি নিয়ে আসে। হোমারের দেবী থেটিস দেবশিল্পী হেফাইস্টোসকে দিয়ে দিব্য অস্ত্র গড়িয়ে পুত্র আখিল্লেওসের কাছে দিলেন হেক্টরকে বধ করবার জন্য। মেঘনাদবধ কাব্যে ইন্দ্র মহামায়ার কাছ থেকে দিব্য অস্ত্র নিয়ে দেবদূত গন্ধর্ব চিত্ররথকে দিয়ে লক্ষ্মণের কাছে পাঠালেন ইন্দ্রজিৎ বধের জন্য। ইলিয়াডে দেতারা প্রথমে কেউ গ্রীক, কেউ বা ট্রোযানদের পক্ষ নিয়ে অলক্ষ্যে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। পরে জিউস তাঁদের ক্ষান্ত করেন। 'মেঘনাদবধে' দেবতারা পুত্রশোকাতুর দুর্জয় রাবণের আক্রমণ থেকে রামকে বাঁচাবার জন্য তাঁর পক্ষে অস্ত্র ধরেছিলেন। শেষে বিষ্ণুর আদেশে গরুড় তাঁদের তেজ হরণ করায় তাঁরা যুদ্ধে বিরত হন। মেঘনাদবধের শেষ সর্গে ইন্দ্রজিতের সৎকার, ইলিয়াডের শেষ সর্গে বর্ণিত হেক্টরের সৎকার অনুষ্ঠানের অনুযায়ী।

গ্রীক্ দৃষ্টিভঙ্গি যে কিছু পরিমাণে মাইকেল আয়ত্ত করেছিলেন, তারও প্রমাণ 'মেঘনাদবধে'র মধ্যে পাই। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'মাইকেল রচনা সম্ভারে'র ভূমিকায় এই গ্রীক-দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে মাইকেলের কাব্যকে বিচার করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি সার্থকভাবে দেখিয়েছেন যে, অখণ্ড সৌন্দর্য সৃষ্টি, পূর্ব সংস্কার মুক্তি, মানবরস এবং ঋজু দৃষ্টি গ্রীক জীবনের এই চারটি বিশিষ্টতা মাইকেলের কাব্য রচনার মধ্যেও প্রকাশিত হয়েছে। সৌন্দর্যের সমগ্র-বোধ থেকেই মাইকেলের প্রায় ছ-হাজার শ্লোকের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রায়

নিখুঁত শিল্পই হয়ে উঠেছে। পূর্ব সংস্কার মুক্তির বলে রামায়ণ কাহিনীকে নতুন করে ঢেলেছেন এবং বিদেশী কাব্য-রীতিকে বাংলা ভাষায় প্রবর্তন করেছেন। মানবরসের রসিক কবি দেব-দানব নির্বিশেষে মানব-স্বভাব আরোপ করেছেন। ঋজু দৃষ্টির বলে জীবনের সঙ্কট মুহূর্তে কোনো বীরের মুখই থেকে অনাবশ্যক হা-হুতাশ প্রকাশ পায়নি। মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণের উক্তিই তার প্রমাণ।

কিন্তু এ ছাড়াও আর একটি বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব 'মেঘনাদবধে' রীতিমতো অনুভব করা যায়, সে হলো গ্রীকদের 'হিরোয়িক কোড'। সে 'কোড' হলো ব্যক্তির বীরত্ব, অহঙ্কার ও খ্যাতির পূর্ণ বিকাশ : 'To strive always for excellence and to surpass all others'[১১].

এই 'ব্যক্তি'র বীরত্ব দেখা গেছে বিশেষ করে মেঘনাদ ও রাবণের মধ্যে। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিরস্ত্র অবস্থায় যখন মেঘনাদ আক্রান্ত হয়েছেন, তখন তিনি ভয় পান নি। লক্ষ্মণের কাছে তিনি বলেছেন যে, অস্ত্র-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে সংগ্রাম করতে তিনি রাজি আছেন। এবং সেই ব্যক্তিগত বীরত্বের প্রকাশ দেখাবার সুযোগ লক্ষ্মণ দিতে চান নি বলেই লক্ষ্মণকে 'তস্কর' বলে নিন্দা করেছেন। মৃত্যুর সময় লক্ষ্মণকে তিনি বলেছেন :

দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে রাবণ রুষিলে ? ষষ্ঠ সর্গ।

রাবণ যখন যুদ্ধে চলেছেন, তখন মন্দোদরীকে তিনি বলেছেন :

বাম এবে, বক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি
আমা দোঁহা প্রতি বিধি। তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার। যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি ;—
রণক্ষেত্রে যাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে ?
বিলোপিব কাল, দেবি, চিরকাল পাব। সপ্তম সর্গ।

মেঘনাদ নিরস্ত্র অবস্থায় যেমন কোনো দেবতাকে স্মরণ করে উত্তেজিত হয়ে লক্ষ্মণকে আঘাত করেন নি তেমনি রাবণও যখন প্রতিবিধিৎসার জন্য সংগ্রামে নেমেছেন, তখনও কোনো দেবতার আশীর্বাদে ধন্য হন নি। এই আত্মনির্ভরশীলতাই হোমারিক বীরত্বের বিশেষ লক্ষণ[১২] :

The most striking single feature of the Homeric ethos is the enormous importance attached to individual prowess,

individual pride, individual reputation. Heroes of other epics prize their individuality also, but in none is the drive for self-assertion so ruthless and pride so paramount as in Homer. In Roman or Christian or Indian Epic, it is a function of heroism to submit individuality, however, grandiose, to a higher sanction ; the Homeric hero may not compromise loyalty to his own being with loyalty to any other, human or divine.

এই ব্যক্তিগত কীর্তিকে বৃহৎ ভাবে দেখবার সূত্রেই গ্রীকরা তাদের বীরদের স্মৃতিকে পরবর্তী কালের মানুষের আদর্শ ও উৎসাহের প্রেরণা হিসেবে দেখেছে। সেই জন্য তাদের মূর্তি, স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতি বাস্তবের অনুকৃতি নয়, আদর্শেরই রূপায়ণ :[১৩]

The Greek memorial was not for use of the dead but of the living, as an example and as an encouragement to emulation That is why classical Greek portrait statues are not realistic but idealised. Men are not shown old or sick or troubled even if they were so when the statue was carved, but in their idealised prime, with individual blemishes glozed over.

মেঘনাদের চিতার ওপর যখন :

ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নির্মিল মিলিয়া
স্বর্ণ পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে
ভেদি অভ্র, মঠ চূড়া উঠিল আকাশে। নবম সর্গ

তখন কি গ্রীক আদর্শে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের কথাই মনে হয় না! কিন্তু মাইকেলের দেশীয় পরিপ্রেক্ষিতে-জ্ঞান এখানে প্রখর। হেক্টরের চিতা নির্বাচিত হয়েছিল জলে নয়, মদ ঢেলে। মেঘনাদ চিতা-ধৌত হয়েছে জাহ্নবীর জলে। হেক্টরের স্মৃতিস্তম্ভ বা মেমোরিয়াল এখানে হয়েছে 'মঠ'।

ইটালিয়ান সাহিত্যের সঙ্গে মূলেই পরিচিত ছিলেন মাইকেল। বিশেষ করে দান্তে এবং তাস্‌সোর ভক্ত ছিলেন তিনি। এ সংবাদ তাঁর চিঠিতেই যে

পাওয়া যায় তা আগেই উল্লেখ করেছি। মনে হয়, মিল্টনের মধ্য দিয়েই এ দু'জনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। অষ্টম সর্গের নরক বর্ণনার ক্ষেত্রে মাইকেল একই সঙ্গে দান্তে, ভার্জিল ও মিল্টনকে অনুসরণ করেছেন। দান্তের কাছে মাইকেলের ঋণ এ ক্ষেত্রে পরোক্ষ মনে হয়। দুটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে।

মাইকেলের পরিকল্পিত তোরণের মুখে লেখা ছিল :

এই পথ দিয়া—
যায় পাপী দুঃখদেশে চির দুঃখভোগে,
হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা প্রবেশ এদেশে। অষ্টম সর্গ।

দান্তের নরকের মুখে লেখা ছিল :

Abandon all hope, ye who enter here.

প্যারাডাইস লস্টে [Book I] মিল্টন তাঁরই অনুসরণে বলেছেন : Hope never comes that comes to all.

দ্বিতীয় উদাহরণটি ওই বিষয়েরই। মাইকেলের পরিকল্পিত নরকের তোরণের সম্মুখে রামচন্দ্র দেখেছিলেন :

কভু শীতে কাঁপে ক্ষীণতনু
থরথরি, ঘোর দাহে কভু বা দহিছে
বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদলপতি। অষ্টম সর্গ।

নরকের বর্ণনায় এই রকম শীত ও উত্তাপের সংমিশ্রণের ছবি মধ্যযুগ থেকে চলে আসছে। প্যারাডাইস লস্টের টীকায় Verity উদ্ধৃতি দিয়েছেন Keightly থেকে[১৪] :

This idea of making the pains of Hell consist in cold as well as heat (i.e., by alternative) was current in the middle ages. . it seems to have come from the Rabbin (Jewish commentators), for they make the torments of Gehena to consist of fire and of frost and snow.

দান্তের Inferno-তে Charon বলেছে : Woe to you ! depraved spirits ! I come to lead you ...into the eternal darkness, into fire and ice. (III, 86, 87) দান্তের Purgatario-তে রয়েছে : To suffer torments both of heat and cold that Power ordains, (III 31, 32).

প্যারাডাইস লস্টের Book II-এর নরক বর্ণনাতে পাওয়া যাচ্ছে যে পাপীরা

feel by turns the bitter change
Of fierce extremes, extremes by change more fierce
From beds of raging fire to starve in ice
Their soft ethereal warmth, and there to pine
Immovable, infixed and frozen round
Periods of time , thence hurried back to fire,

II. 598-603

এইভাবে মাইকেল মিল্টনের মাধ্যমেই পরোক্ষভাবে দান্তের কাছে ঋণী। তাসোর কাব্য মাইকেলকে ইতালিয়ান কাব্যরস ও বিশেষ করে ottava rima-র প্রতি আকর্ষণ জাগিয়েছে। প্রথম সর্গে লঙ্কার চরম সঙ্কটে প্রমোদে মত্ত রয়েছেন বলে প্রবল আত্মগ্লানিতে মেঘনাদ বিলাসের উপকরণ, পুষ্পমাল্য ও অলঙ্কার ইত্যাদি দূরে নিক্ষেপ করেছেন। Gerusalomme Liberata-তে (Book XVI, 31.) এরকম ঘটনা দেখছি। সেখানে Rinaldo-কে দেখছি :

His nice attire in scorn he rent and tore ,
For his bondage vile that witness bore ;—
That done,—he hasted from the charmed fort

এ ছাড়া প্রথম সর্গে প্রমীলার বিলাপ আর্মিডার বিলাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রমীলা-চরিত্রের ওপর সাধারণভাবে আর্মিডা ও ক্লোরিণ্ডার প্রভাব বিশেষভাবে অনুভব করা যায়।

ল্যাটিন কবি ভার্জিলের কাছে প্রত্যক্ষভাবে মাইকেল অনেক বেশী পরিমাণে ঋণী। অষ্টম সর্গে নরক দর্শনের পূর্বে রামচন্দ্র দেখছিলেন :

অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত।
বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী
বজ্রনাদে , রহি রহি উথলিছে বেগে
তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্ত পাত্রে পয়ঃ
উচ্ছ্বসিয়া ধূমপুঞ্জ, ত্রস্ত অগ্নিতেজে।

ইনিদের [Aeneid] Book VI-এ দেখতে পাচ্ছি[১৫] :

Aeneas looked off to the side and suddenly saw under a cliff to the left a far-scattered castle surrounded by a triple wall. Around this, Phlegethon, the rapid river of Hell, flows with rolling flames and hurls up surrounding rocks.

প্যারাডাইস লস্টের Book I-এ পাওয়া যাচ্ছে :

.....he views
the dismal situation, waste and wild ,
A dungeon horrible, on all sides round,
As one great furnace flamed, yet from the flames
No light, but rather darkness visible
Served only to discover sights of woe . .

মাইকেল বলছেন :

সহসা পুরিল—
ভৈরব আবাবে বন, পলাইল রডে
ভূতকুল শুষ্ক পত্র, উড়ি যায় যথা,
বহিলে প্রবল ঝড।

এই উপমা হোমার, ভার্জিল ও দান্তের মধ্যে আছে। ইনিদের Book VI এ পাচ্ছি : 'Thick as the leaves in autumn strew the woods .....the army stands'. প্যারাডাইস লস্টেও পাচ্ছি : [Book I]

....and called
His legions, Angel forms, who lay embraced,
Thick as autumnal leaves that strew the books
In Vallombrosa . .

ইনিদের প্রত্যক্ষ প্রভাব বহু ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। যেমন প্রেতপুরী বর্ণনাতে। প্রথম যখন রামচন্দ্র প্রেত-পুরীর দিকে চলেছেন তখন মাইকেল বর্ণনা দিচ্ছেন :

চলিলা রাঘব শ্রেষ্ঠ, তিমির কানন
পথে পথী চলে যথা, যবে নিশাভাগে
সুধাংশুর অংশু পশি হাসে সে কাননে।
আগে আগে মায়া দেবী চলিলা নীরবে।

ইনিদের Book VI-এ Descent to Hades বর্ণনাতে পাওয়া যাচ্ছে :

It was such a trip as one takes in the forest under the trecherous light of a feeble moon, when Jupiter has hid the heavens in shadow and the dark night has taken away colour from nature.

নরক বর্ণনার অন্য একস্থানে মাইকেল বলছেন :

যমদূত হানে দণ্ড মস্তক প্রদেশে,
কাটে কৃমি, বজ্রনখা, মাংসাহারী পাখী
উড়ি পড়ি ছায়া দেহে ছিঁড়ে নাড়ি ভুঁড়ি
হুহুঙ্কারে।

ইনিদেব মধ্যে পাচ্ছি :

A huge vulture with a hooked beak, plucking the evergrowing lever and the vitals, tears at the feast and lives under the high breast of Tityus.

নবক অতিক্রম করে রামচন্দ্র দেখতে পেলেন রম্য কানন আর স্বর্ণ সৌধ। পশ্চিমদ্বারে গিয়ে রামচন্দ্র দেখলেন, বংশের নিদান দিলীপ সুদক্ষিণার সংগে বসে আছেন স্বর্ণাসনে। এইখানেই অন্যান্য পূর্ব পুরুষেরা এসে বসেন। পূর্ব পুরুষেব এই বাসস্থান ও তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-বর্ণনায় মাইকেল ইনিদের Book VI-এর Elysian Fields বর্ণনার অনুসরণ করেছেন। Aeneas তাঁর পিতা Anchises-এর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে এই fields-এর মধ্যে পৌছেছিলেন। মাইকেল বলেছেন :

সত্যযুগরণে
সম্মুখ সমরে হত রথীশ্বর যত
দেখ এই ক্ষেত্রে আজি ক্ষত্র চূড়ামণি।

ভার্জিলও সেই fields-এ-'the ancient race of Teucer, a most illustrious progeny, great heroes born in better years'-এর বর্ণনা দিয়েছেন। দশবথের সঙ্গে রামচন্দ্রের মিলন দৃশ্যটি Anchises-এর সঙ্গে Aeneas-এর মিলনদৃশ্যেব প্রায় মর্মানুবাদ।

সবশেষে মিল্টনের কথা। মিল্টন ছাড়া পূর্ববর্তী যে কবিদের কথা আলোচিত হয়েছে তাঁরা সকলেই মাইকেলের শ্রদ্ধেয় কবি। কিন্তু মিল্টন ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি। তিনি চিঠিতে এক জায়গায় লিখছেন :

The poem is rising into splendid popularity. Some say it is better than Milton—but that is all bosh—nothing can be better than Milton, many say it licks Kalidas, I have no objection to that. I don't think it is impossible to equal Vergil and Tasso. Though glorious, still they are mortal poets, Milton is divine.

অন্য চিঠিতে লিখেছেন যে, মিল্টনের Satan-এর মহত্ত্ব তাঁকে মুগ্ধ করেছে। সে মহত্ত্ব মনকে উঁচুতে টানে হৃদয়কে স্পর্শ করে না। মিল্টনের মহাকাব্য-প্রতিভা যেন Satan-এর মধ্য দিয়েই প্রকাশিত এবং প্যারাডাইস লস্টের একটি মাত্র যুদ্ধের অনুসবণেই সপ্তম সর্গে মাইকেল যুদ্ধ এনেছেন। কোন সন্দেহ নেই, Satan-এর মহত্ত্ব মাইকেল বক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন রাবণের মধ্যে। সর্বত্রই তিনি elevation of mind-এর দিকে নজর দিয়েছেন। চিঠিতে পাওয়া যাচ্ছে, দ্বিতীয় সর্গ যখন লিখেছেন, তখন কুপার-এর ইলিয়াডের অনুবাদ এবং তারই অনুসারী মিল্টনের প্রারম্ভিক কৌশলটিকে তিনি আয়ত্ত করেছেন। আর একটি চিঠিতে শেক্‌স্‌পিয়ার ও মিল্টনের ব্যবহৃত একটি আদিরসাত্মক উপমাকে কী ভাবে বাংলায় রূপান্তরিত করা যায় তারই পরীক্ষা করেছেন। ইতিপূর্বে মিল্টনের মধ্য দিয়ে কী ভাবে হোমার, ভার্জিল, দান্তে ইত্যাদিকে আত্মসাৎ করেছেন সেকথা আলোচিত হয়েছে। প্রথম সর্গে বারুণী-মুরলা প্রসঙ্গ মিল্টনের 'Comus' কাব্যের সেবার্ন নদীব অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সাব্রিনা এবং তাঁর সঙ্গী লিজিয়ার কথোপকথনের অনুসরণে রচিত। তৃতীয় সর্গে প্রমীলা ও মেঘনাদ মৃত্যুপুরী লঙ্কায় যখন সুখী-দম্পতির মতো সোনার সিংহাসনে বসলেন তখন চারদিকেব নৃত্যোৎসবের সঙ্গে মাইকেল তুলনা দিলেন : 'ভুলি নিজ দুঃখ, পিঞ্জর মাঝারে,/গায় পাখী'। আসন্ন বিচ্ছেদের এই সংকেতদানে মধুসূদনের দক্ষতা প্রায় মিল্টনেরই সমধর্মী। মিল্টনও প্যারাডাইস লস্টের চতুর্থ সর্গে আদম ও ইভের মিলনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে ইভের সঙ্গে প্যানডোবার তুলনা এনে তিনি ওই একই ট্র্যাজেডির পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। তাছাড়া প্যারাডাইস লস্টের পঞ্চম সর্গেও দেখি অ্যাডাম ও ইভের নিদ্রা ভঙ্গের বর্ণনার অনুসরণে মাইকেল ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার জাগরণ বর্ণনা করেছেন। মেঘনাদের মৃত্যুতে যেমন বাবণ খেদ করেছেন, ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়েছেন, মিনতি করেন নি ভগবানের কাছে :

'কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা ?—ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে।'

প্যারাডাইস লস্টে Satan বলেছে :

Since by fate the strength of Gods
And this empyreal substance cannot fail.....

এই গ্রীক fate-এর লীলা মিল্টনকে যেমন আকৃষ্ট করেছে, মাইকেলকেও তেমনি আকৃষ্ট করেছে। এই fate-এর সুযোগ নিয়েই মাইকেল মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত লীলা দেখাতে সমর্থ হয়েছেন।

মেঘনাদবধ কাব্যে এই বিচিত্র আদর্শের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এইটুকু মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে এই বিচিত্র স্ব-বিরোধী প্রভাবের [গ্রীক অদৃষ্টবাদ ও খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব] ঊর্ধ্বে চলে গেছে মাইকেলের হিন্দুমন। প্রেত-পুরীর কল্পনায় পৃথিবীর তলদেশে যে ভৌতিক-দেশ কল্পিত হয়েছে সেখানে পৌঁছে রাম যখন মায়াদেবীকে প্রশ্ন করছেন যে লঙ্কার যুদ্ধে হত রাক্ষসবীরগণ ও সদ্য নিহত মেঘনাদকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কেন, তখন মায়াদেবী বলেছেন :

অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত,
নাহি গতি এ নগরে, হে বৈদেহী পতি !
নগর বাহিরে দেশ, ভ্রমে তথা প্রাণী,
যতদিন প্রেতক্রিয়া না সাধে বান্ধবে
যতনে, বিবির বিধি কহিনু তোমারে।

কিন্তু ভার্জিলের এই প্রেতপুরী শেষ পর্যন্ত হিন্দু কল্পনার শিবলোকে পরিণত হয়েছে। মেঘনাদের সৎকারের সময় দেখি :

ইরম্মদ বেগে অগ্নি ধাইলা ভূতলে।
সহসা জ্বলিল চিতা। সচকিত সবে
দেখিলা আগ্নেয় রথ, সুবর্ণ আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসব বিজয়ী
দিব্য মূর্তি। বাম ভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে,
চিরসুখহাসিরাশি মধুর অধরে।
উঠিল গগনপথে রথবর বেগে,

বরষিলা পুষ্পাসার দেবকুল মিলি,
পূরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে।

এই জন্যই রাজনারায়ণ বসু বলেছিলেন[১৬] :

'ইহাতে [নরক বর্ণনা] হোমর, ভার্জিল, দান্তে, মিল্টন এবং ব্যাসের কবিতার অনেক অনুকরণ আছে, কিন্তু আমি অনেকবার বলিয়াছি যে, আমাদিগের কবি নিরবচ্ছিন্ন অনুকরণকারী নহেন। মিল্টন যেমন অন্যান্য কবির অনুকরণ করিয়াছেন, তিনিও সেইরূপ করিয়াছেন।'

শুধু নরক বর্ণনা নয়, সাধারণভাবেই এই কথা সত্য। সমস্ত বিদেশী অনুকরণের ওপর তাঁর দেশীয় সংস্কার জয়ী হয়েছে। রাজনারায়ণ বসু আরও বলেছিলেন[১৭] :

'পাঁচ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা কবিতা যেরূপ অসংস্কৃত অবস্থায় ছিল, তাহা দেখিয়া সে সময়ে কে বলিতে পারিত যে অল্পকালের মধ্যে স্থল বিশেষে ভাবের উচ্চতায় প্রায় হোমারের ইলিয়ড ও মিল্টনের প্যারাডাইস লস্টের ন্যায় এবং স্থলবিশেষে করুণ রসের বাল্মীকির রামায়ণের সমকক্ষ একখানি অমিত্রাক্ষর বাঙ্গালা কাব্য প্রচারিত হইবে !'

এই কারণেই মাইকেল যখন নিজের কাব্য সম্পর্কে রায় দিয়ে বলেছিলেন, বাংলা সাহিত্যে সত্যিকারের কাব্য এই প্রথম, তখন রাজনারায়ণ তাতে সায় দিয়েছিলেন।

মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের আগেই [১৮৬১] 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত হয়। প্রাচীন বাংলা কাব্যে রাধার অবৈধ প্রেম আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ব্রজাঙ্গনা নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা। সে রীতি আর কিছু নয়, ওই পুরোনো আধ্যাত্মিক আবরণটিকে রাধার মানবিক দেহ থেকে খসিয়ে নেওয়া হয়েছে। বৈষ্ণব পদকর্তাদের ভক্তি, নিষ্ঠা ও বিশ্বাস মাইকেলে নেই। কিন্তু বিরহকে প্রকাশ করবার আন্তরিকতা আছে। কতকগুলি বিষয় অবলম্বন করে (বংশীধ্বনি, জলধর, যমুনাতটে, ময়ূরী, পৃথিবী, প্রতিধ্বনি, উষা, কুসুম, মলয় মারুত, গোধূলি, গোবর্দ্ধন গিরি, সারিকা, কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি) সেগুলির অনুসঙ্গে রাধার মনোবেদনা ব্যক্ত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণ প্রেমকে একেবারে মানবিক রূপে প্রকাশ করবার পদ্ধতিটি যুগ-পরিবেশের অনিবার্য ফল। বিদেশী সাহিত্য-রসিক কবির চোখে পদাবলীর মানবিক রস নতুন করে পরিবেশিত হলো।

এরপর ওভিদের Heroides কাব্যের অনুসরণে মধুসূদন লিখলেন 'বীরাঙ্গনা কাব্য' [১৮৬২]। খৃষ্টের সমসাময়িক যুগের কবি ওভিদ তাঁর উজ্জ্বল, পরিচ্ছন্ন অথচ কৃত্রিম রচনারীতির দ্বারা মধ্যযুগের ও রেনেশাঁস যুগের বহু কবির প্রিয় হয়েছিলেন, এমন কি রোমান্টিক যুগের পরবর্তী কবিরাও তাঁর ভক্ত হয়েছিলেন। বাংলা কাব্যে মাইকেলই ওভিদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ওভিদের কাব্যে একুশটি চিঠি আছে [তার মধ্যে শেষ ছটি ওভিদের নয় বলে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন]। মধুসূদনেরও ইচ্ছা ছিল একুশটি চিঠি সম্বলিত কাব্য লিখবেন। কিন্তু এগারোটি সম্পূর্ণ হয়েছিল। পরে কয়েকটির সূচনা করেছিলেন, শেষ করতে পারেন নি।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নারী-সমাজের সম্মান ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে রামমোহন থেকে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, দ্বিতীয়ার্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্য দিয়ে সে আন্দোলন সার্থক হলো। নারীর আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার পিছনে বিদেশী চিন্তাশীলদের বিশেষ দান আবশ্যই ছিল। জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের একটা প্রধান অঙ্গ নারী-স্বাধীনতা—এই হলো চিন্তাশীলদের মত। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সমর্থন করে মাইকেল তাঁর আয়ের কিছু অংশ চাঁদা বাবদ পাঠিয়েছিলেন। চিঠিতেই তার প্রমাণ রয়েছে। এই নারী সমাজের উদ্বোধন প্রচেষ্টার পরিবেশেই বীরাঙ্গনাদের উদ্ভব। এবং উদ্ভাবক তাঁর কাব্যটি উৎসর্গ করেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে। ওভিদের মতো মাইকেলও তাঁর চিঠিগুলির মধ্যে নায়িকাদের ভাব প্রকাশে লিরিক উচ্ছ্বাসের সুযোগ নিয়েছেন। কিন্তু ওভিদের অনুসরণ থাকলেও বর্ণনা-ভঙ্গিতে উভয়ের পার্থক্য বেশ চোখে পড়ে। ওভিদের চিঠির প্রারম্ভিক পংক্তিগুলি তেমন নাটকীয় নয়, ঘটনার উপস্থাপনেও নাটকীয়তার বিশেষ অভাব। Heroides থেকে কয়েকটি চিঠির প্রারম্ভিক পংক্তি উদ্ধার করে দেখানো যেতে পারে[১৮] :

ক. I, your Phyllis, who welcomed you to Rhodope, Demophoon, complain that the promised day is past, and you not here.

Phyllis to Demophoon.

খ. From stolen Briseis is the writing you read, scarce charactered in Greek by her barbarian hand. Whatever

blots you shall see her tears have made ; but tears too have none the less the weight of words.

Briseis to Achilles.

গ. All fearful, I read what you wrote without so much as a murmur, lest my tongue unwittingly might swear by some divinity. Cydippe to Acontius.

পাশাপাশি বীরাঙ্গনার পত্রিকাগুলির কয়েকটি প্রারম্ভিক পংক্তি বিচার করা যাক :

ক. কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশুনিধি,
তোমারে অভাগী তারা ? গুরুপত্নী আমি
তোমার,..... 'সোমের প্রতি তারা'।

খ. একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে,
রঘুরাজ ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে !
'দশরথের প্রতি কেকয়ী।'

গ. বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি
হ্রেষে অশ্ব, গর্জে গজ, উড়িছে আকাশে
রাজকেতু ; মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য , কিন্তু কোন হেতু ?
'নীলধ্বজের প্রতি জনা।'

মাইকেলের এই চিঠিগুলি সত্যিকারের dramatic monologue। 'In medias-res'-এ কাহিনীর মাঝখান থেকে কোন একটি চরিত্রকে তুলে ধরে তার স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা কিংবা মনোবেদনার ইতিহাস, সামাজিক সম্পর্ক বা পরিবেশের বর্ণনা দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য। প্রসঙ্গত অন্য চরিত্রের উপস্থিতি, তাদের প্রতিক্রিয়া এবং উক্তিও বক্তার বক্তব্যের মধ্যে ফুটে ওঠা চাই। বিদেশী-সাহিত্যের এই বিশিষ্ট রচনাপদ্ধতি অবলম্বন করে মাইকেল তাঁর যুগের একটা বিশিষ্ট ভাবনাকে রূপ দিয়েছিলেন।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে বীরাঙ্গনার চিঠিগুলির রচনাভঙ্গি ওভিদের রচনা-রীতির দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছে। যেমন শকুন্তলা তাঁর চিঠির শেষের দিকে লিখছেন :

কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি, ধরে
তৃণে, আর কিছু যদি না পায় সম্মুখে !
জীবনের আশা হায়, কে ত্যজে সহজে !

Phyllis বলছেন :

Hope, too, has been slow to leave me , we are tardy in believing, when belief brings hurt. Even my love is loath to let me think you wrong me.

তারপর Phyllis যেমন বলেছেন :

Oft have I been false to myself in my defence of you ; oft have I thought the gusty breezes of the South were bringing back your white sails.

তেমনি শকুন্তলাও প্রতারিত হয়েছেন :

হেরি যদি ধূলারাশি, হে নাথ আকাশে ;
পবন স্বনন যদি শুনি দূর বনে ,
অমনি চমকি ভাবি, ····
পুরবাসী যত
আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে !

Phyllis যেমন অভিমানে বলেছেন :

. . . .after all these, under your own image let be inscribed these words ; This is he whose wiles betrayed the hostess that loved him.

তেমনি অভিমানবশে কেকয়ী বলেছেন :

লিখিব গাছের ছালে নিবিড় কাননে,
পরম অধর্মচারী রঘুকুল পতি !

Briseis যেমন বলেছেন :

Whatever blots you shall see, her tears have made, but tears too, have none the less the weight of words.

মাইকেল অনেকটা যেন তারই অনুসরণে বলেছেন তারার মুখ দিয়ে :

লয়ে ফুলবৃন্ত, কান্ত, নয়ন কাজলে
লিখিনু·····

Phaedra যেমন অনুপস্থিত Hippolytus-কে বিচলিত করার জন্য কৌশল করে বলেছেন :

I mingle with these prayers my tears as well, The words of her who prays, you are reading , her tears, imagine you behold !

মাইকেলের তারা এবং সুর্পণখা ঠিক এই কৌশলই নিয়েছেন।

Briseis যেমন তার বিরহক্লিষ্ট শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়েছেন Achilles-কে, শকুন্তলাও সেই অবস্থার কথা জানিয়েছেন দুষ্মন্তকে। Brseies বলছেন :

Gone is my flesh, and gone my colour, what spirit I still have is but sustained by hope in vain.

শকুন্তলা বলছেন :

মলিন বাকলে
আববি মলিন দেহ , নাহি অন্নে রুচি ,
না জানি কি কহি কারে হায় শূন্য মনে !

এছাড়া ওভিদের নায়িকাবা যেমন স্বপ্ন দেখেছেন এবং সে স্বপ্নের বিবরণ জানিয়ে তাঁদের মিলনেচ্ছাকে তীব্রতর করে তুলেছেন, তেমনি মধুসূদনকেও শকুন্তলা ও রুক্মিণীর মধ্যে এই কৌশল অবলম্বন কবতে দেখেছি।

কিন্তু ওভিদের অনুসরণ করলেও মধুসূদন কোথাও দেশীয় ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ন করবার চেষ্টা করেন নি। বরং চিঠিপত্রের সম্ভাবনাময় মুহূর্তগুলিকে নায়িকাদের জীবনে আবিষ্কার করে আশ্চর্য দক্ষতায় অনৌচিত্য দোষ এড়িয়ে প্রত্যেকটি নায়িকাকে দেশীয় পরিবেশে জীবন্ত করেছেন। এবং, হোমারিক যুগের সমুদ্র-তীরবর্তিনী প্রতীক্ষাবতাদের থেকে পৃথক করে তুলেছেন।

'মেঘনাদবধ কাব্য' বচনার সময়েই [১৮৬০] মাইকেলেব সনেট রচনা করবার ইচ্ছা জেগেছিল। রাজনারায়ণ বসুকে তিনি তাঁর প্রথম রচিত সনেটটি লিখে পঠিয়েছিলেন। মাইকেলের হাতেই এই নবাগত ইটালীয়ান কাব্যরীতি —'সনেটের' প্রতিষ্ঠা হলো। ছাত্রজীবনে এবং মাদ্রাজে থাকতে ইংরিজিতে তিনি সনেট লিখেছিলেন। বিদেশে গিয়ে পেত্রার্কের রচনায় অনুপ্রেরিত হয়ে বাংলায় 'scribbling' করতে আরম্ভ করেন। তারপর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' প্রকাশিত হলো। মাইকেল তখন ভের্সাইতে।

স্বদেশের প্রতি nostalgia এই বিদেশী কাব্যরীতির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিল। 'উপক্রম' নামক সনেট দুটির শেষেরটিতে কবি বলেছেন যে, পেত্রার্ক যে 'সনেট' লিখে ইটালিতে, তার স্বদেশে, প্রশংসা পেয়েছিলেন, তিনি তাঁরই অনুসরণ করে 'ভারতে ভারতী পদ উপযুক্ত গণি' সেই কাব্যরীতি-রত্নকে উপহার দিয়েছেন। প্রথম সনেটটি লিখেই চিঠিতে লিখেছিলেন :

'In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our Sonnet in time would rival the Italian.'

বাংলা সনেটের ইতিহাসে ইটালিয়ান আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত সর্বত্র হয়নি, কিন্তু সনেটের কাব্যশিল্পে মাইকেলের অনুসরণে বহু বাঙালী কবি আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় দিয়ে উপরিউক্ত মন্তব্যকে অমূল্য গুরুত্ব দিয়েছেন।

মাইকেল মোট একশো আটটি সনেট লিখেছেন। নানা বিষয়ে সনেটগুলি লেখা। কোনোটি আত্মকথামূলক, কোনোটি প্রেমমূলক, কোনোটি প্রকৃতি-বিষয়ক, কোনোটি পৌরাণিক বা মানবিক প্রশস্তিমূলক, কোনোটি বা সাহিত্য ও কাব্যবিষয়ক। এ ছাড়াও নানা বিষয়ে সনেট লিখেছেন তিনি। বাংলা দেশের নানা উৎসব ও প্রকৃতি তাঁর বিষয় জুগিয়েছে। রেনেসাঁস যুগে সনেট ছিল প্রধানত প্রেমানুভূতির বাহন। মিল্টনই প্রথম সনেটকে রাজনৈতিক ও নৈতিক জিজ্ঞাসার বাহন করে তুললেন। সাম্প্রতিক কালের কবিরা যে কোনো বিষয়ের সংক্ষিপ্ত লিরিক উচ্ছ্বাসকে সনেটের আকারে রূপ দেন। মাইকেলও রেনেসাঁস যুগের আদর্শ মানেন নি, মিল্টনের হাতে যে সনেটের বিষয় সার্বজনীন হবার সূচনা দেখা দিয়েছে, তাকেই মাইকেল গ্রহণ করেছেন।

লক্ষণীয় যে, এই সনেটগুলির মধ্যে একটি মিল্টনের অন্যতম গুরু দান্তের উদ্দেশ্যে, একটি সমসাময়িক ফ্রান্সের রোম্যান্টিক-যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি উগোর উদ্দেশ্যে এবং আরেকটি সমসাময়িক ভিক্টোরিয়ান ইংল্যাণ্ডের অন্যতম কবি টেনিসনের উদ্দেশ্যে লেখা। এছাড়া 'ভাষা' ও 'ভারত ভূমি' এই দুটি কবিতায় যথাক্রমে হোরেস থেকে এবং ফেলিকায়া থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং এই উদ্ধৃতির অন্তর্গত ভাব দুটিকে স্বদেশের ভাষা ও স্বদেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনায় বিস্তারিত করেছেন। উগো এবং টেনিসন এই দুই জীবিত কবিই মাইকেলের বন্দনা পেয়েছেন। তাছাড়া ছাত্রজীবনে বন্দনা পেয়েছিলেন তৎকালীন জীবিত কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ। আগেই বলেছি, মাইকেল যখন

ফ্রান্সে, তখন সেখানে উগো-পরবর্তী লেখকদের প্রাধান্য, কিন্তু তাঁদের কোনো উল্লেখ মাইকেলে নেই।

এ ছাড়া কতকগুলি নীতিবিষয়ক কবিতা লিখে বাংলা কাব্যের নতুন দিক-নির্দেশ করে গেছেন মাইকেল। ভের্সাইতে থাকতে 'ভরসেল্‌স্ নগরে রাজপুরী ও উদ্যান' নামক সনেটে মাইকেল পূর্বতন ফরাসী কবিদের কথা স্মরণ করেছিলেন। সনেট রচনার সময়েই তাঁর নীতিকবিতাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল :

'...আমরা উপর্যুক্ত সুভদ্রাহরণ, তিলোত্তমা ও হিতোপদেশের যে অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা 'অসমাপ্ত কাব্যাবলি' শিরোনাম দিয়া চতুর্দশপদীর শেষভাগে সংযোজিত করিয়াছিলাম।'

এই হিতোপদেশ অংশে 'ময়ূর ও গৌরী', 'কাক ও শৃগালী' এবং 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা' নামে তিনটি কবিতা আছে। এই কবিতাগুলি সংস্কৃত হিতোপদেশের বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত নয়। ফরাসী কবি লা ফঁতেনের [১৬২১-১৬৯৫] ইসপের গল্প অবলম্বনে কতকগুলি কবিতা আছে।[১৯] লা ফঁতেনের 'ওকগাছ ও নলখাগড়া' [Le Chene et Le Roseau] অবলম্বন করে মাইকেল লিখেছিলেন 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা', 'জুনোর কাছে ময়ূরের নালিশ' [Le paon se plaignant a Junon] অবলম্বনে লিখেছিলেন 'ময়ূর ও গৌরী', 'কাক ও শৃগাল' [Le Corbeau et le Renard] কবিতার অনুসরণে লিখেছিলেন 'কাক ও শৃগালী'র কাহিনী। তবে লা ফঁতেন প্রাচীন গল্পের মধ্যেই সরলভাবে নীতি-উপদেশ দেবার চেষ্টা করেছিলেন, সরল কথার আড়ালে একটু কৌতুকের হাসির আভাসও ছিল। সে সব মাইকেলে নেই।

বাংলা কাব্যরীতি মাইকেলের হাতে নতুন রূপ নিল। শব্দ-চয়নে, শব্দ সৃষ্টিতে, বাক্যের মধ্যে শব্দ সজ্জায়, ছন্দবীনিতে, প্রকৃতি ও আকৃতির দিক থেকে [আকৃতি বলতে ছন্দবন্ধ, পর্ব, পদ ও মিল বোঝাচ্ছি] —বাংলা কাব্যভাষা একেবারে অপরিচিত রূপে বাঙালির অনভ্যস্ত কানে আঘাত করলো। বহু ব্যবহৃত শব্দ, পরিচিত রূপক-উৎপ্রেক্ষা-উপমার বন্ধন কেটে তিনি সংস্কৃত থেকে এবং লৌকিক জীবন থেকে শব্দ নিয়ে, বিদেশী এবং দেশী আদর্শে শব্দ তৈরি করে এবং প্রয়োজন

মতো শব্দকে গড়েপিঠে নতুন শক্তি দিয়ে বাংলা কাব্যকে নতুন রূপে ও গতিচাঞ্চল্যে মণ্ডিত করলেন। লক্ষণীয় এই, নতুন শব্দকে প্রয়োগচাতুর্যের বলে তার অর্থকে স্বয়ংপ্রকাশ করে তুলেছেন মাইকেল। যেমন :

ক। অনন্তর পথে—
চলিল কনক রথ মনোরথ গতি।

খ। ইরম্মদে ধাঁধি বিশ্ব গর্জিল অশনি।

গ। উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে।

ঘ। অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্যক্ষ।

ঙ। রসানে মার্জিত
হেমকান্তি সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল।

অনেক ক্ষেত্রে লৌকিক শব্দ ব্যবহারে শ্রুতিকটুতা দেখা দিলেও [যেমন 'টানিল হুঁড়কা ধরি হড় হড করি', 'ফাঁফর হইয়া সখি, খুলিনু সত্বরে কঙ্কণ বলয়'] কোথাও কোথাও ভাব প্রকাশের পক্ষে অনুকূল হয়েছে। যেমন :

ক. আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে? তৃতীয় সর্গ।

খ. যেমতি তস্কর আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে
পুঁতি যথা রত্নরাশি রাখে যে গোপনে পরধন। চতুর্থ সর্গ।

বিদেশী প্রকাশভঙ্গির অনুযায়ী যেসব শব্দ সৃষ্টি করেছেন তার পিছনে রয়েছে গ্রীক বিশেষণভঙ্গি। 'শ্বেতভুজা'র কথা আগেই বলেছি। এছাড়া কারারুদ্ধ বায়ুদল জলদলপতি, দেবাকৃতি, দেবকুলপ্রিয়, রাক্ষস-ভরসা, অগ্নিময় তেজঃ বাজী [fiery steed], ঊর্মিলা-বিলাসী, বাসবত্রাস, বীরযোনি, জগত-কামনা, দম্ভোলি-নিক্ষেপী ইত্যাদি শব্দগুলি সমাসবদ্ধ, সংক্ষেপিত। মহাকাব্যের ঘটনার ঘনঘটার মধ্যে এই সংক্ষেপিত বিশেষণগুলির দ্বারা চরিত্রদ্যোতনা করে কবি হোমারের সমধর্মী হতে চেয়েছেন।

প্রবহমান পয়ারবন্ধে ইংরিজি রচনাদর্শ গ্রহণ করেছেন মাইকেল। ফলে বহু ক্ষেত্রে ইংরিজির মতো শব্দ-সজ্জা, ইংরিজির মধ্য দিয়ে ইটালিয়ান ঐতিহ্যের অনুসরণ বহু ক্ষেত্রেই দূরান্বয় ও বন্ধনীপ্রয়োগে ছন্দের প্রবহমানতার মধ্যে ধীর ও দ্রুত লয়ের মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ইংরিজির মতো শব্দসজ্জার কথাই ধরা যাক।

ক. যেমতি, মাতঃ বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)

যবে খরতর শরে, গহন কাননে
ক্রৌঞ্চবধূসহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর সতি! প্রথম সর্গ।

খ. কহিও, যেখানে তাঁর রাঙা পা দুখানি
রাখিতেন শশীমুখী বসি পদ্মাসনে,
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি,
আঁধারি জলধিগৃহ, গিয়াছেন গৃহে। প্রথম সর্গ।

গ. কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুৎ ছটা
ঝলে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে। তৃতীয় সর্গ।

বিশেষ করে যেখানেই উপমা-উৎপ্রেক্ষার প্রয়োজন হয়েছে সেখানেই ইংরিজি clause-এর মতো করে তাকে প্রকাশ করেছেন। যেমন :

১। দ্বিরদ-রদ নির্মিত গৃহদ্বার দিয়া
বাহিরিলা সুহাসিনী, মেঘাবৃতা যেন
উষা,— দ্বিতীয় সর্গ।

২। হায়, দেবী, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমুল শিম্বী ফুটাইলে বনে,
উড়ি যায় তুলারাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল সমরে। প্রথম সর্গ।

বাংলা কাব্যের শব্দ-সজ্জা-রীতির মধ্যে বিপর্যয় এনে মাইকেল ভাবকে কখনও তরঙ্গিত, কখনো সীমাবদ্ধ, কখনও বা প্রবাহিত করবার চেষ্টা করলেন। একে বলা হয় inversion of the syntax। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতিকে মাইকেল অস্বীকার করে বললেন : 'it did not matter'। ইংরিজি ও অন্যান্য ভাষার সাহিত্য পাঠে তাঁর কান অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কাজেই ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্যই মাইকেল 'বরুণানী'কে অগ্রাহ্য করে 'বারুণী'কে গ্রহণ করলেন। যেহেতু বাংলা analytical ভাষা, সেহেতু সংকোচের প্রয়োজনে [অবশ্যই ছন্দের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই] নামধাতুর প্রয়োগ বাড়াতে হোল 'সোম প্রকাশে' [৭ই জুলাই ১৮৭০] পণ্ডিত মহেশচন্দ্র শর্মা লিখেছিলেন :

'দত্ত মহাশয় তাঁহার কাব্যে এক প্রকার নূতন বাঙ্গালা ভাষা আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ঐরূপ ভাষা যে বঙ্গদেশে কোনো কালে প্রচলিত ছিল এরূপ

বোধ হয় না। এতদ্‌ভিন্ন মেঘনাদবধ কাব্যে ক্লিষ্টতা, সমাপ্ত-পুনরাপ্ততা ও কষ্টতা প্রভৃতি দোষও বহুতর।'

ভোলানাথ চন্দ্র লিখলেন, মাইকেলের বাঙলা পদগুলি ইয়োরোপীয় আদর্শে তৈরি। তৃতীয়ত, প্রাচীন কবিদের ব্যবহৃত অনুপ্রাস যমককে ইংরিজি শিক্ষিতরা অনেকেই অনুমোদন করতেন না। কিন্তু প্রবহমান পয়ারে মিলের অভাব পাঠকের কানে অনভ্যস্ত ঠেকবার ফলে মাইকেলের কাছে অনুপ্রাস যমক প্রয়োজনীয় মনে হলো। কিছুটা আভ্যন্তরীণ মিলের (internal rhyming) কাজ করে বলেই বোধ হয় মাইকেল ওগুলিকে প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি :

ক. বীর পুত্র ধাত্রী এ কনক পুরী,
দেখ বীরশূন্য এবে, নিদাঘে যেমতি
ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী।
বরজে সঞ্চারু পশি বারুইর যথা
ছিন্নভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর। প্রথম সর্গ।

খ. কি কারণে, কহলো সজনি,
সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা ?
দেখ, থরথর করি কাঁপে মুক্তাময়ী
গৃহচূড়া। পুনঃ বুঝি দুষ্ট বায়ুকুল
যুঝিতে তরঙ্গচয়-সঙ্গে দিল দেখা। প্রথম সর্গ।

গ. আশীষিলা দশরথ দাশরথি শূরে,
পিতৃপদধূলি পুত্র লইবার আশে,
অর্পিলা চরণপদ্মে করপদ্ম বৃথা। অষ্টম সর্গ।

চতুর্থত, ইংরিজির মতো দূরান্বয় ও বন্ধনীপ্রয়োগের উদাহরণ শব্দ-সজ্জার জন্য উদ্ধৃত তিনটি উদাহরণেই পাওয়া যাবে। এ ছাড়াও দু একটি অংশ উদ্ধার করছি :

ক. অশোকবনে বসি দিবানিশি
(কুঞ্জবনসখী পাখী পিঞ্জরে যেমতি)
কাঁদেন রূপসী শোকে। দ্বিতীয় সর্গ।

খ. কি মনোবেদনা
সহেন বিধুবদনা পতির বিহনে

রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায়রে যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি), "ডাকিছে কুজনে
হৈমবতী ঊষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখীকুল।··· ·· পঞ্চম সর্গ।

গ. পশিলা পুরে রক্ষঃ অনীকিনী—
রণবিজয়িনী ভীমা চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজে নাশি দেবী, তাণ্ডবে উল্লাসে,
অট্টহাসি রক্তারবে, ফিরিলা নিনাদি,
রক্তস্রোতে আর্দ্রদেহে। সপ্তম সর্গ।

পঞ্চমত, ইংরিজির মাধ্যমে, বিশেষ করে মিল্টনের মাধ্যমে, অনেক ইটালিয়ান ভাষাগত বৈশিষ্ট্যকে মাইকেল আত্মসাৎ করেছেন। তাসোর অনুসরণে মিল্টন তাঁর সতত-গম্ভীর ভাষায় ধ্বনিস্পন্দনের মধ্যে (মিল্টন সম্পর্কে মাইকেলের মন্তব্য স্মরণীয় : We hear the sound of his ethereal voice with awe and trembling. His is the deep roar of a lion in the silent solitude of the forest) শব্দ প্রয়োগের চাতুর্য আনবার চেষ্টা করেছেন। দেখতে পাওয়া যাবে, শুধু মিলের অভাব পূরণের জন্য বা অন্তলীন মিল সৃষ্টি করবার জন্যই কাব্যভাষায় শব্দালঙ্কার ও শব্দসজ্জার বিপর্যয় আনেন নি তিনি। বোধহয় মহাকাব্যিক গাম্ভীর্যের একঘেয়েমি দূর করবার জন্যও এই কৌশলের প্রয়োগ। মিল্টনের এই শব্দ-শ্লেষ, যমক, ধ্বনিব্যঞ্জনার প্রতি ঝোঁক, বাক্যের শব্দ-প্রয়োগে বিপর্যয় সম্পর্কে F. T. Prince লিখেছেন[২০] :

> In Milton's epic poetry there is an incessant, sometimes obtrusive, activity of mind at the level of verbal wit : there is play upon words, sometimes in puns, sometimes in emphasizing the jingling qualities of words of different or kindred meaning, sometimes in twisting grostesquely ingenious complexities of syntax. These freaks of fancy are combined with a remorseless chopping of logic, above all in speeches, which has a similar effect.

The effect is, above all, to compensate for the somewhat stupefying power of the 'magnificent' diction, to add possiblities of surprise to a technique of which one of the chief dangers is monotony. The play upon words and the metaphysical or logical conceits are not indeed alien to the epic style, for ingenuity is here omnipresent in one form or another , it is present in the artificial word-order and in the music of the verse no less than in the assiduous search for what is astounding in thought and image and emotion.

যেমন :

ক Serpent, we might have spar'd our coming hither,
Fruitless to me, though Fruit be here to excess.
[P. L. Book IX // 647-48]

খ Which tempted our attempt, and wrought our fall
[P. L. Book I / 642]

গ. him who disobeys
mee disobeys [P. L. Book V // 611 12]

ঘ. Thoughts, which how found they harbour in the breast
Adam, misthought of her to thee so dear ?
[P. L. Book IX // 288-9]

মিল্টনের গুরু তাসোর মধ্যেও দেখছি[১২] :

ক. But of the plants once more who speaks not the plaint. [Mondo Careato, Giornata Terza]

খ. Not avarice, nor infamous famishment for gold
[Ibid, Giornata Terza]

গ. Altri son della mano a' vezzi avezzi
(others are skilled in the charms of the hand) [Ibid]

মাইকেলের মধ্যেও এই সচেতনতা—অনুপ্রাস, ধ্বন্যর্থের প্রতি ঝোঁক, যমক ও শব্দ সজ্জার বিপর্যয় রূপে দেখা গেছে। যেমন :

'সেকালের বাঙ্গালী সন্তান বলিয়া মধুসূদনের একটা সুবিধা হইয়াছিল—তিনি কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতির কাব্য বাল্যকালেই পড়িয়াছিলেন এবং সেজন্য খাটি বাংলাও যেমন আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তেমনি তাহার ছন্দেও তাঁহার কান অভ্যস্ত ছিল। ইহার পর ভারতচন্দ্রের কাব্যে সেই বাংলা ভাষা ও ছন্দের যতখানি শিল্পোৎকর্ষ হইয়াছিল, তাহা তিনি নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কার্যতঃ তিনি তৎকাল প্রচলিত কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের কাব্য হইতেই তাঁহার ছন্দের চরণ আহরণ করিয়াছিলেন, এবং ভারতচন্দ্র হইতে তিনি ছন্দের মধ্যে বাংলা বাক্‌ভঙ্গির স্থান সম্বন্ধে, বিশেষ ইঙ্গিতও পাইয়াছিলেন। চৌদ্দ অক্ষরের ওই চরণ এবং ভাষার কথঞ্চিৎ মার্জিত সাধুরীতি এবং ছন্দের মধ্যে বাক্‌ভঙ্গির কিছু কিছু ইঙ্গিত—ইহার বেশী কিছু তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী কবিদের নিকট হইতে পান নাই, এবং ইহাই সম্বল করিয়া তিনি বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন।.....মধুসূদন নিজে তাঁহার এই ছন্দের নির্মাণ-কৌশল সম্বন্ধে বেশী কিছু বলেন নাই।.. তিনি যে মিল্টনের ছন্দের আদর্শেই এই বাংলা ছন্দ গড়িয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই , কিন্তু তাহা সম্ভব হইল কেমন করিয়া ? মিল্টনের পূর্বে যেমন Marlowe, Shakespeare—বাঙালী কবির গুরুও তেমনই মিল্টন। বাংলা ছন্দের আদর্শ সন্ধান করিতে হইবে ইংরাজী কাব্যে—এমন কথা কে কবে শুনিয়াছে !

'মিল্টনের সেই five stress line-এর মাপে বাংলা পয়ারের মাপে যে অনেকটা মেলে, তাহা বুঝি, কিন্তু তাহার সেই five-stress, আর এই একটানা সুরের এক সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ছন্দ—ইহাদের মধ্যে মিল কোথায় ? তবে মধুসূদন তাহাতে হটিলেন না , তিনি নাকি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া বলিয়াছেন—বাংলার পশ্চাতে তাহার জননী (বা মাতামহী) রূপে দাঁড়াইয়া আছে সংস্কৃত , অতএব ফরাসী ভাষার মত ভাষাতেও যাহা সম্ভব হয় নাই, বাঙলায় সেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ অনায়াসে সম্ভব হইবে। ইহাতে না হয় ভাষাকে সমৃদ্ধ করিবার সুন্দর ও সুগম্ভীর শব্দরাজি আহরণ করিবার উপায় হইতে পারে ; কিন্তু ইংরাজী five stress line-এর সেই rhythm কেমন করিয়া আমদানি করা যাইবে ?

'বাঙলা ছন্দের ওই মাপটি বড়ই সুবিধাজনক হইয়াছিল এবং সম্ভবত এই মাপটিই তাঁহার সবচেয়ে বড় ভরসার কারণ হইয়াছিল। ইংরাজি blank verse-এর চরণে যে দশটি অক্ষর (syllable) আছে, তাহা বাঙলা বর্ণমাত্রিক অক্ষর নয়—তাহার প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গে যে একটি করিয়া হসন্তবর্ণ থাকে, তাহার জন্য, কালের হিসাবে সে চরণের মাপ আমাদের পয়ারের মাপ অপেক্ষা বরং একটু বেশীই হইবে।

'অতএব এই মাপটি বড়ই ভালো পাওয়া গিয়াছিল। আমার মনে হয়, ঠিক ঐ চৌদ্দ অক্ষরের ছন্দ তৈয়ারী না থাকিলে, বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা সম্ভব হইত না। বাংলায় যে এই ছন্দ সম্ভব হইয়াছে, তাহার কারণ ভাষার প্রকৃতিবশে পয়ার সেই ১৬ মাত্রার সকল উপসর্গ দূর করিয়া খাঁটি চৌদ্দ বর্ণের চরণে পরিণত হইতে পারিয়াছিল। সেই চরণকে লইয়াই মধুসূদন তাঁহার ছন্দকে তরঙ্গিত এবং সেই তরঙ্গিত ছন্দ-প্রবাহকে কূলপ্লাবী করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ মাপ একটা বড় কথা; চৌদ্দ অক্ষরের তটসীমা লঙ্ঘন করিয়া যে স্রোত প্রবাহিয়া চলিয়াছে, তাহা ঐ rhythm বা তরঙ্গেরই স্রোতোবেগ। ছন্দ সেই তটবন্ধন স্বীকার করিয়াই এমন মুক্তগতি লাভ করে। ইহাই এ ছন্দের সবচেয়ে বড় রহস্য। এই মাপ যদি ঠিক না থাকে, তবে এ ছন্দের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যায়; তখন তাহা গদ্য কিংবা অন্য কোন ছন্দ হইয়া দাঁড়ায়।'

ইংরিজি সাহিত্যে নাটকেই প্রথম প্রবহমান ছন্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। নাটক এবং কাব্যের প্রবহমান ছন্দের মধ্যে যে পার্থক্য থাকা প্রয়োজন সে সম্পর্কে সচেতন থেকেই মাইকেল কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লিখছেন :

> The verse is what in English we would call, 'Alexandrine' i.e. containing 6 feet. The longest verse in our language is 7 footed পয়ার—but that is like the Greek and Roman Hexameter, too long and pompous for dramatic purposes. The Greek and Latin dramas are not written in Hexameter. Our 7 footed verse is 'heroic' measure.

তিনি মিল্টনের দৃঢ়বন্ধের প্রবহমান ছন্দের আদর্শকেই নিয়েছিলেন। কারণ মিল্টনও নাট্যকাব্য এবং বিশুদ্ধ কাব্যের ছন্দগত পৃথক উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের

কথা ভুলে যান নি। শেকস্‌পিয়ার যে স্বাধীন পদ-ভাগে blank verse ব্যবহার করেছেন, মিল্টন সে স্বাধীনতাকে সুশৃঙ্খলতায় বেঁধেছিলেন। তা ছাড়া মহিমান্বিত অসম যতিবিভাগের পদগুলিকে এক একটি verse paragraph-এ তিনি যে ভাবে গ্রথিত করেছেন তাতে মিল্টনের এই ছন্দ আশ্চর্য সংহত হয়েছে। মধুসূদনের এই ছিল আদর্শ। পয়ারকে নাট্য-সংলাপের পক্ষে বেশী দীর্ঘ এবং মহিমাব্যঞ্জক বলে তিনি মনে করতেন বলে অপেক্ষাকৃত লঘু যতিবিভাগ ব্যবহারের কথা চিন্তা করেছেন এবং তার ফলে 'পদ্মাবতী' নাটকে (চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক) মুক্তকের আভাস পাওয়া যাচ্ছে :

> কলি। (স্বগত) এই ত হরণ করি আনিনু রাণীরে
> এ ঘোর কাননে। এবে কোথায় ইন্দ্রাণী?
> যে প্রতিজ্ঞা তাঁর কাছে করেছিনু আমি,
> রক্ষা করিয়াছি তাহা পরম কৌশলে,—
> (কলির কৌশল কভু হয় কি বিফল?)
> যাই এবে স্বর্গে। (অবলোকন করিয়া)
> অহো! এই যে পৌলোমী
> মুরজার সঙ্গে—
> (শচী এবং মুরজার প্রবেশ)
> (প্রকাশ্যে) দেবি, আশীর্বাদ করি।
>
> ইত্যাদি

এ ছাড়া 'বিবিধ কাব্যে'র অন্তর্গত নীতিগর্ভ কাব্য পর্যায়ে এগারোটি কবিতায় মাইকেলের মুক্তক রচনার পরীক্ষা লক্ষণীয় (গদা ও সদা, ময়ূর ও ময়ূরী, কুক্কুট ও মণি ইত্যাদি)।

বাঙলা ছন্দের ক্ষেত্রে মধুসূদনের আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো সনেটের আদর্শে চতুর্দশপদী কবিতা রচনা। ছাত্র জীবনের রচনায় Sonnets : To a Star during a cloudy night নামে নটি সনেট-গুচ্ছ এবং Sonnet: Written at the Hindu College নামে একটি সনেট পাওয়া যাচ্ছে। এই রচনায় মিল বিন্যাসে খানিকটা পেত্রার্কের অনুসরণ এবং খানিকটা স্বাধীন ভাবে রচনার আভাস পাওয়া যায়। তখনও বাংলায় সনেট লেখেন নি তিনি। তবে সনেট রচনার আঙ্গিক সম্পর্কে প্রথম জীবনেই কবির সচেতনতা এবং Iambic

heroic verse-এর প্রতি অনুরাগ পরবর্তী জীবনের বাংলা কাব্যের (সনেটের তো বটেই) নতুন ছন্দবন্ধ রচনার সহায়ক হয়েছিল। মাদ্রাজে থাকতেই Timothy Penpoem ছদ্মনামে দুটি সনেট রচনা করেছেন। কিন্তু বাংলা সনেটের সূত্রপাত ১৮৬০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে। সেই সময়েই বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে সনেটের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন রাজনারায়ণ বসুকে। পরে ১৮৬৫-তে ভের্সাইতে থাকার সময় পেত্রার্কের সনেট পড়ে আবার সনেট রচনায় আগ্রহী হন। ঐ বছরই ২৬শে জানুয়ারী গৌরদাসকে তিনি চারটি সনেট পাঠিয়ে সঙ্গে মন্তব্য জুড়েছেন :

> I have been lately reading Petrarca—the Italian poet, and scribbling some sonnets after his manner. I dear say the sonnet চতুর্দশপদী will do wonderfully well in our language. [চতুর্দশপদী কবিতাবলী : ভূমিকা : সা. প সং.]

তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলী প্রকাশিত হয় ১৮৬৬-র ১লা আগষ্ট। তার পরও কিছু সনেট লিখেছিলেন তিনি। এবং আগেই বলেছি তাঁর সনেটের মোট সংখ্যা হলো একশ' আট।

ফর্মের দিক থেকে কিছুটা পেত্রার্কের সঙ্গে মিল থাকলেও (অষ্টকের দুটি মিলের প্রয়োগ) তাঁর Laura poems এর রচনাদর্শ মধুসূদন প্রায় গ্রহণই করেন নি। শেকস্‌পিয়ারকেও ফর্ম বা বিষয়বস্তুর দিক্ থেকে বিশেষ অনুসরণ করেন নি। তবে মিলটনের আদর্শ এবং রোম্যান্টিক যুগে পেত্রার্কীয় আদর্শের ভিত্তিতে ইংরেজ কবিদের স্বাধীন রচনাদর্শ মধুসূদনকে উৎসাহিত করেছিল মনে হয়।

ইটালিয়ান সনেটের পংক্তি-মাপের আদর্শ একাদশ দল। ফরাসী সনেট সাধারণত দ্বাদশ দলে রচিত। ইংরিজি সনেটের স্বাভাবিক মাপ দশ দল পংক্তি। বাঙলায় মাইকেল ইংরেজি পঞ্চদ্বিদল পর্বিক heroic verse-এর বিকল্প চতুর্দশ মাত্রিক পয়ারবন্ধেই তাঁর আদর্শ পেয়েছিলেন। (পূর্বে উদ্ধৃত মোহিতলাল মজুমদারের উক্তিটি এক্ষেত্রে স্মরণীয়) তাঁর এক শ' আটটি সনেটের মধ্যে[২৪] পাঁচটিতে (বঙ্গ ভাষা, কাশীরাম দাস, জয়দেব, মেঘদূত ২, পুরুলিয়া) শেকস্‌পিরীয় মিল দিয়েছেন। সেখানেও কিন্তু বিশুদ্ধ শেকস্‌পিরীয় রীতির তিনটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকের শেষে একটি দ্বিপংক্তিক মিল মাত্র 'বঙ্গভাষা' ও 'কাশীরাম দাস' এই দুটিতে রয়েছে। প্রচলিত পেত্রার্কীয় পংক্তি-মিলে মধুসূদন মাত্র

একটি সনেট লিখেছেন 'কমলে কামিনী'। সেক্ষেত্রেও অষ্টকের মাঝে চতুষ্পংক্তিক বিভাগ বা ষট্‌কের মাঝে ত্রিপংক্তিক বিভাগ রাখেন নি। পেত্রার্কের আদর্শে লিখিত পংক্তি-মিলে লেখা একটি ভালো সনেট হোল 'বিজয়া দশমী'। কিন্তু বেশীর ভাগ সনেটেই স্পষ্ট ভাবে অষ্টক-ষট্‌ক ভাবের বিভাগ রক্ষিত হয়নি। সেদিক থেকে মিল্টনের সনেটের সঙ্গেই তাদের বেশী সাদৃশ্য দেখা যায়। জর্জ সেন্টস্‌বেরী মিল্টনের সনেট সম্পর্কে লিখেছেন :[২৫]

> To Milton, indeed, the sonnet is much more than a verse paragraph

এ মন্তব্য মাইকেল সম্পর্কেও প্রযোজ্য। কারণ এক শ' আটটি সনেটের মধ্যে একান্নটিতে মাইকেল ভাবের আবর্তন রক্ষা করেন নি। সাতটি সনেটে দুটি করে চতুর্দশপদী দিয়ে সনেট-পরম্পরা রচনা করেছেন। কবিতাগুলি পড়লে দুটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত একটি কবিতা বলেই মনে হয়। বিষয়বস্তুর দিক থেকে যে পেত্রার্ক-শেকস্‌পিয়ারের প্রেম বর্ণনার আদর্শ তিনি মানেন নি তা আগেই বলেছি। সনেটের অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ বা দ্বাদশ পংক্তিক-দ্বিপংক্তিক ভাগ করে ভাবের আবর্তনও রক্ষা করেন নি। অনুরূপ প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য মধুসূদনের চতুর্দশপদী রচনার ক্ষেত্রেও লক্ষিত হয়। মিল্টনের সনেটে প্রবহমান Blank Verse ব্যবহৃত হয়েছে, মাইকেলও চতুর্দশপদীতে প্রবহমান পয়ারবন্ধ ব্যবহার করেছেন। ফলে মাইকেলকে মিল্টনের অনুগামী সনেটকার বলতে হয়।

'ব্রজাঙ্গনা'কে মাইকেল Odes নামে অভিহিত করেছিলেন। ১৮৬০-এর জুলাইতে বাঙলা কাব্যে নতুন রীতির ছন্দবন্ধ প্রবর্তন করতে গিয়ে মাইকেল রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন :

> I have made up my mind to write (Deo Volente!) three short poems in Blank Verse and then do something in rhyme ; don't fancy I am going to inflict পয়ার and ত্রিপদী on you No ! I mean to construct a stanza like the Ottava Rima and write a romantic tale in it

প্রকৃত Ottava Rima-র [abababcc] মিল বিন্যাসে আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে মাইকেল কোনো কবিতা না লিখলেও পদ-পংক্তির ভাগে এবং মিল বিন্যাসে ও স্তবক রচনায় যে আদর্শ প্রবর্তন করলেন, পরবর্তী কবিদের ওপর

তার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়েছিল। গুপ্তকবিই প্রথম স্তবক গঠনের পরীক্ষা করেছিলেন। মিল বিন্যাসে বৈচিত্র্য না আনলেও একটি বিশিষ্ট পংক্তিকে প্রত্যেক পংক্তিগুচ্ছের শেষে এনে স্তবকের ভাবগত পূর্ণতার আভাস দিয়েছিলেন। রঙ্গলাল তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' দ্বিপদী ত্রিপদী পংক্তির সমন্বয়ে দ্বিপংক্তিক স্তবক রচনায় দীর্ঘ আট ও দশ মাত্রা পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁর পদ-পংক্তির বিন্যাসে সুগ্রন্থনার অভাব ও ভাবগত সম্পূর্ণতার অভাব দেখতে পাওয়া যায়। বঙ্গলাল তাঁর সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদেও পয়ার ও ত্রিপদী বন্ধের শ্লোক বিভাগ ছাড়া স্তবক রচনার চেষ্টাই করেন নি। মাইকেল ইয়োরোপীয় কাব্যের স্তবক বন্ধের বৈচিত্র্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলেই বাঙলা কাব্যে এই বৈচিত্র্যধর্মী ছন্দবন্ধ রচনারীতির প্রবর্তন করেছিলেন। মিল বিন্যাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে 'ব্রজাঙ্গনা' থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে :

ক. শমীর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলে
কিন্তু সে কি বিরহ অনল, বসুন্ধরে ?
তা হলে বনশোভিনী
জীবন যৌবন তাপে হারাত তাপিনী
বিরহ দুরূহ দুহে হরে।
পুড়ি আমি অভাগিনী,
চেয়ে দেখ না মেদিনি,
পুড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে। পৃথিবীতে ৩।

খ. বসো আসি, শশিমুখি, আমার আঁচলে
কমল আসনে যথা কমলবাসিনী।
ধরিয়া তোমার গলা, কাঁদি লো আমি অবলা,
ক্ষণেক ভুলি এ জ্বালা, ওহে প্রবাহিনি!
এস গো বসি দুজনে এ বিজন স্থলে। যমুনাতটে ৩।

গ. নমি আমি, শৈলরাজ, তোমার চরণে
রাধা এ দাসীর নাম—গোকুল গোপিনী;
কেনে যে এসেছি আমি তোমার সদনে
শরমে মরম কথা কহিব কেমনে,
আমি দেব, কুলের কামিনী ?

কিন্তু দিবা অবসানে, হেরি তারে কেনা জানে,
নলিনী মলিনী ধনী কাহার বিহনে
কাহার বিরহানল তাপে তাপিত সে সরঃ সুশোভিনী ?
গোবর্দ্ধন গিরি ১।

ঘ. সে কালে-জ্বলেবে মন স্মরিলে সে কথা, ক
মঞ্জুকুঞ্জবন,— খ
ছায়া তব সহচরী সোহাগে বসাতো ধরি গ
মাধবে অধীনী সহপাতি ফুলাসন, খ
মুঞ্জরিত তরুবলী, গুঞ্জরিত যত অলি, ঘ
কুসুম-কামিনী তুলি ঘোমটা অমনি, ঙ
মলয় সৌরভ ধন, বিতরিত অনুক্ষণ, খ
দাতা যথা রাজেন্দ্র নন্দিনী—গন্ধামোদে চ
মোদিয়া কানন। খ
নিকুঞ্জবনে ৩।

অনেক সময়ে দেখা গেছে, ভাবের কোমলতা সঞ্চার করতে গিয়ে মাইকেল ছন্দকেও কোমল সুবাশ্রয়ী করেছেন মাঝে মাঝে। 'বসন্তে' কবিতাটির স্তবক রচনায় যথাসম্ভব যুক্তাক্ষর বর্জন করেছেন। রুদ্ধদলকে সরল কলামাত্রিক রীতির প্রসারিত উচ্চারণে ব্যবহার করেছেন। যেমন: 'পিককুল কলকল চঞ্চল অলিদল'। এখানে 'চঞ্চল' শব্দটির প্রসারিত চার মাত্রার উচ্চারণ লক্ষণীয়। তা ছাড়া মুক্তদল শব্দ এবং পংক্তি-শেষের বিজোড় মাত্রার পদ অনেক সময়েই ছন্দে কোমল ধ্বনি-প্রবাহ এনে দিয়েছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'বিবিধ কাব্য' পর্যায়ে 'দেবদানবীয়ম্' মহাকাব্যের মাত্র আট পংক্তি লিখেছিলেন মাইকেল। নানা কারণে বিশেষ ভাবে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে সে কবিতাংশটি :

কাব্যেকখানি রচিবারে চাহি,
কহো কি ছন্দঃ পছন্দ, দেবি।
কহো কি ছন্দঃ মহানন্দ দেবে
মনীষবৃন্দে, এ সুরঙ্গ দেশে ?
তোমার বীণা দেহ মোর হাতে,
বাজাইয়া তায় যশস্বী হবো.

অমৃত রূপে তব কৃপাবারি
দেহ জননি গো, ঢালি এ পেটে।

এ ক্ষেত্রে ছন্দের প্রকৃতি-ধর্মে বিশিষ্টতা আছে। ছন্দের ধ্বনি-সৌষম্য বজায় রেখে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের দ্বারা ৬/৬ মাত্রা ভাগে ১২ মাত্রার পংক্তিটি পড়তে হবে। এই নতুন উচ্চারণ-রীতির পরীক্ষা পরে কবি করেন নি। এটি অমিল পংক্তিবন্ধের পূর্ণ স্তবক বলেই মনে হয়। 'পঞ্চকোট গিরি বিদায় সঙ্গীত' কবিতাটি সমিল প্রবহমান অসমান পংক্তিতে রচনা করেছেন মাইকেল। মিল বিন্যাসও স্বরধ্বনি-নির্ভর 'নীতিগর্ভ কাব্য' পর্যায়ে সমিল মুক্তকের আভাস পাওয়া গেছে সে কথা আগেই বলেছি। কিন্তু দুবান্বিত মিলের যে পরীক্ষা করেছেন তিনি, সে পরীক্ষা রবীন্দ্র-পরবর্তীদের করতে দেখা গেছে। এই পর্যায়ের 'অশ্ব ও কুরঙ্গ' কবিতায় মাইকেল শিথিল মিলে মুক্তকের আদর্শে স্তবকবন্ধ রচনা করেছেন। কবিতাটির প্রত্যেকটি স্তবকেই পংক্তি-বিন্যাসের পার্থক্য আছে। দুটি উদাহরণ দিচ্ছি :

ক. হয়ের হৃদয় হইল ভয়, ভাবে এ সামান্য প্রশ্ন নয়, ক
শিবে শৃঙ্গ শাখাময় ক
বুঝি বা শূলের তুল্য ধার ঘ
কে আমারে দিবে পরিচয় ? ক
স্তবক ৬।

খ. কহিল তুরঙ্গ,—পশু উচ্চ-শৃঙ্গ-ধারী ক
মোর রাজ্য এবে অধিকারী : ক
না চাহিল অনুমতি, খ কর্কশভাষী সে অতি, খ
হও সে সহায় মোর, গ মরি দুই জনে চোর। গ
স্তবক ৮।

'মেঘ ও চাতক' কবিতায় প্রথমে ও শেষে দ্বিপদী পংক্তির মিল রেখে মাঝে যতিপ্রান্তিক মিত্রাক্ষর একপদী পংক্তি দিয়ে স্তবক রচনার আভাস ফুটিয়েছেন। যাই হোক, মাইকেলের হাতেই ইংরেজি stanza formation-এর পরিচয় পেলাম। তিনিই আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে, স্তবক কবিতার প্যারাগ্রাফ মাত্র নয়। তার নিজস্ব মূল্য আছে। কবিতার মূল ভাবসূত্রের এক একটি গ্রন্থিই হলো স্তবক, কিন্তু সেই গ্রন্থির মধ্যেও গ্রন্থনার কৌশলে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ

ভাব থাকে। কতকগুলি ছোট-বড় পংক্তিকে নানা ভঙ্গিতে যোগ করে মিল সংস্থানে বৈচিত্র্য এনেই সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবতরঙ্গ আনা যায়। উদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

১। একথা মাইকেল রাজনারায়ণকে যে বলেছিলেন রাজনারায়ণের চিঠিতেই তার প্রমাণ রয়েছে : Meghnad is going through a second edition and a real B.A. has written a long preface, echoing your verdict, namely, that it is the first poem in the language. : মধুস্মৃতি নগেন্দ্রনাথ সোম [১৩৬১] : পৃ. ১৫২।

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : [দ্বিতীয় খণ্ড : ১৩৬২] সুকুমার সেন। পৃ. ১২০।

৩। সাহিত্য সাধক চরিতমালা : দ্বিতীয় খণ্ড। মাইকেল মধুসূদন দত্ত : পৃ. ২৪-২৫।

৪। হেমচন্দ্র [প্রথম খণ্ড] : মন্মথনাথ ঘোষ : পৃ. ২৫-২৬।

৫। কবি শ্রীমধুসূদন : মোহিতলাল মজুমদার : পৃ. ১৮-১৯।

৬। অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে [দ্বিতীয় খণ্ড : ১৩৬২] এগুলির উল্লেখ করেছেন। পৃ ১১৯।

৭। Iliad Penguin Classics [1951] Ed. by E. V. Rieu, Page 243.

৮। মধুসূদন গ্রন্থাবলী : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

৯। মাইকেল রচনাসম্ভার, মিত্র ও ঘোষ। ভূমিকা।

১০। The Homeric Gods : W. F. Otto. Page 131 দ্রষ্টব্য।

১১। Humanism , Moses Hadas 1960, George Allen and Unwin, London . The Heroic Code. Page 18.

১২। Humanism Moses Hadas [1960] Page 21.

১৩। Ibid. Page 25

১৪। Paradise Lost, Book I and II. Ed. by A. W, Verity, Cambridge [1915] Page 121-122.

১৫। Aeneid : Tr. by Kevin Guinagh. এই অনুবাদ থেকে Aeneid-এর সব উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে।

১৬। মধুস্মৃতি : নগেন্দ্রনাথ সোম [১৩৬১] : পৃ. ১৪০।

১৭। ঐ । পৃ. ১৪৩।

১৮। Heroides : Ovid : Loeb Classical Library : Tr. by Grant Showerman [1947] এই বই থেকে Heroides- এর সব উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে।

১৯। সাহিত্য সাধক চরিতমালার 'মধুসূদন দত্ত' দ্রষ্টব্য। 'দেশ' পত্রিকায় 'মধুসূদন ও লাফঁতেন' নামে একটি সুন্দর আলোচনা করেছিলেন সতীনাথ ভাদুড়ি। [৩০ পৌষ, ১৩৬৭]।

২০। The Italian Element in Miltonic Verse : F. T. Prince. Pages 123-124, 126-127, Miltonic Blank verse : The Diction. অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

২১। ১৯ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২২। ২০ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২৩। বাংলা কবিতার ছন্দ : মোহিতলালের মজুমদার। [১৩৫২] ২য় ভাগ ৩য় অধ্যায়, পৃ ৮৮-৮৯।

২৪। এই সম্পর্কে শ্রীনীলরতন সেনের 'আধুনিক বাংলা ছন্দ' পৃষ্ঠা ৭৩-র পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২৫। A History of English Prosody, Vol II, Page 217.